দাম : যোলো টাকা

স্বস্তিকা

একাকিত্বের দুনিয়ায় কড়া নাড়ছে অনলাইন জুয়ার দুনিয়া— পৃঃ২৬

বিশ্বে আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও ভারতের মুদ্রাস্ফীতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে— পৃঃ ১৫

৭৫ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।। ২১ নভেম্বর, ২০২২।। ৪ অগ্রহায়ণ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

অনলাইন গেমিংয়ে বিপন্ন কৈশোর

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২১ নভেম্বর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

মতুয়া নয়, মুসলমান ভোটের জন্য বাঙ্গলাভাগের ঠুলি পরানো হচ্ছে □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

অখিল লজ্জায় বাংলা □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

গুজরাটের নির্বাচনে বিরাট কোনো রাজনৈতিক উথালপাতাল হবে না □ আর জগন্নাথন □ ৮

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে দেশপ্রেমের রাজনীতিই একমাত্র সম্বল □ বিশ্বামিত্র □ ১০

উপনির্বাচনের ফলাফলে বিরোধীদের বিপদঘণ্টা

□ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১১

শুভ জন্মদিন পুরুলিয়া □ সৌম্যদীপ ব্যানার্জি □ ১৩

বিশ্বে আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও ভারতের মুদ্রাস্ফীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে □ আনন্দমোহন দাস □ ১৫

বুনিয়াদি স্তরের রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সক্ষম করার একটি পথ □ রবিরঞ্জন সেন □ ১৭

কেষ্ট ও তাঁর কন্যার লক্ষ্মীলাভে নজরে লটারি

□ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ১৮

গ্যাম্বলিং আর গেমের তফাত গুলিয়ে দিচ্ছে অনলাইন অ্যাপ

□ দীপ্তাস্য যশ □ ২৩

একাকিত্বের দরজায় কড়া নাড়ছে অনলাইন জুয়ার দুনিয়া

□ নিখিল চিত্রকর □ ২৬

অমৃত লাভের অমৃতকথা □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

বাঙ্গলার সর্বাধিক পূজিতা মাতৃদেবতা দেবী মনসা

□ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩৪

অনুচ্চারিত ইতিহাসের রহস্যভেদ □ দেবযানী ভট্টাচার্য্য □ ৩৫

শ্রীরামচন্দ্রের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ অমূলক

□ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ৪৩

কেশবরাও দীক্ষিত ছিলেন মানুষ গড়ার আদর্শ কারিগর

□ বিধান হালদার □ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ খেলা : ৪৭ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ২৮ নভেম্বর ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৮ নভেম্বর ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাষ্ট্রপতিকে কটুকথা

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে ইঙ্গিত করে তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরি সম্প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গও প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যাটি এই বিষয় নিয়েই।

লিখবেন ড. রাজলক্ষ্মী বসু, বিমলশংকর নন্দ প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড নম্বর-সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অনলাইন গেম একটি মরণফাঁদ

মানব কল্যাণে বিজ্ঞান মানুষের হাতে তুলিয়া দিয়াছে প্রযুক্তি। ইহা নিশ্চিতভাবেই মানব সভ্যতার বিকাশে আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু তাহার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এখন অভিশাপস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। এখন শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের খেলার মাঠে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাড়ির মধ্যে ঘরের কোণে তাহারা মোবাইল ফোন লইয়া অনলাইন গেমসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুঁদ হইয়া সময় কাটাইয়া দিতেছে। একটি সমীক্ষায় উঠিয়া আসিয়াছে, অন্তর্জাল ব্যবহারকারীদের ৩৫ শতাংশ হইতেছে মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী। ইহারাই অনলাইন গেমসে সবচাইতে বেশি আসক্ত। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনলাইন গেমিং সম্পর্কে সতর্ক করিয়া বলিয়াছে, ইহা কোকেন ও জুয়ার নেশার মতো আসক্তি উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা রাখিতে পারে। সকলেই জানেন, নেশা এক বিষম বস্তু। ইহা শুধু কোনো ব্যক্তির সম্ভাবনাময় জীবনকেই ধ্বংস করে না, উপরন্তু একটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকেও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। ইতিহাসে ইহার অনেক উদাহরণ রহিয়াছে। এখন এই নেশার অঙ্গনেও লাগিয়াছে ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া। ইহার জন্যই ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ও ক্ষতিকর ভিডিয়ো গেমসে বুঁদ হইয়া থাকিবার নেশায় মাতিয়াছে বর্তমান প্রজন্ম। ব্লু হোয়েল-সহ নানাপ্রকার গেম অ্যাপসের কারণে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া কম বয়সিরা আত্মহত্যা পর্যন্ত করিয়া বসিতেছে। অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এইপ্রকার গেমিং অ্যাপস পুঁজিবাদী সভ্যতার বিনোদনমাধ্যম। অনলাইন অ্যাকশন গেমের জন্য বেশ কয়েকটি ভার্চুয়াল উপকরণ ক্রয় করিতে হয়। ইহার জন্য টাকার প্রয়োজন পড়িয়া থাকে। টাকার জন্য খোলোয়াড়দের বাবা-মায়ের পকেট ফাঁকা করা অথবা অসদুপায় অবলম্বন করিবার কথাও শোনা যাইতেছে। এই বিনোদন শুধু টকার বিনিময়ে আনন্দ দান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছে না, কাড়িয়া লইতেছে সময়, সম্পদ, মেধা, শারীরিক ও মনসিক সুস্থতা-সহ জীবন পর্যন্ত। নিজের অজান্তে একটি প্রজন্ম স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতায় আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই অনলাইন গেমসের আসক্তিকে এক প্রকার বিশেষ মানসিক রোগ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছে। তাহারা এই রোগের নাম দিয়াছে গেমিং ডিসঅর্ডার বা গেমিং রোগ।

বিচলিত করিবার মতো বিষয় হইল, এই অনলাইন গেম শুধুমাত্র বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া জুয়াখেলায় পরিণত হইয়াছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, রিয়েল মানি গেমস প্রভৃতির মতো অনলাইন অ্যাপসের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম জুয়াখেলায় আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে ছাত্র, পরিযায়ী শ্রমিক ও ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীরাও শামিল। খেলার নেশায় উনিশ হইতে পঁচিশ বৎসরের যুবক-যুবতীরা আত্মহত্যা অথবা অন্যকোনো অসৎ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে। অনলাইন জুয়াখেলায় আসক্তরা প্রথমে টাকা বাজি রাখিয়া খেলাটি শুরু করিয়া থাকে। ইহার জন্য তাহারা ক্রেডিট ও ডেবিড কার্ড বা ইউপিআইয়ের মতো অনলাইন পেমেন্ট মোডের মাধ্যমে বেট রাখিতে রাখিতে ক্রমেই সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। এইভাবে তাহারা নিজে ও পরিবারকে আর্থিক সংকটের মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে। মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, অনলাইন জুয়াখেলা ড্রাগের নেশার চাইতে কম নহে। ড্রাগ সেবনকারীদের মতো ইহারাও অনলাইন গেম ও জুয়া খেলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। নিশ্চিতভাবেই বর্তমান প্রজন্মের এই মানসিকতা দেশ, জাতি ও সমাজের পক্ষে এক ভয়ংকর বিপদসংকেত।

দুঃখের বিষয় হইল, কেহ কেহ ইহাকে বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থোপার্জনের একটি মাধ্যম বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। আরও বেশি মাত্রায় আসক্ত করিবার জন্য বহু মোবাইল ব্র্যান্ড গেম টুর্নামেন্টেরও আয়োজন করিতেছে। বিজয়ীদের বিশাল পুরস্কারের লোভ দেখানো হইতেছে। ইহার জন্য ক্রিকেট ও চলচ্চিত্র জগতের তারকাদের দ্বারা বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইতেছে। তাঁহারা ইহাকে দক্ষতা বৃদ্ধির খেলা বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। সমাজের ভালো-মন্দের বিষয়ে তাঁহাদের ভাবনাচিন্তা নাই। অর্থই তাঁহাদের নিকট বড়ো বিষয়। ইহার মধ্যেও স্বস্তির বিষয় হইল, বিপদ বুঝিতে পারিয়া আমাদের দেশের ছয়টি রাজ্য সরকার বেশ কয়েকটি অনলাইন গেমিং অ্যাপ নিষিদ্ধ করিয়াছে অথবা অনুমতি বাতিল করিয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে তিনি এই প্রকার ১৩২টি অ্যাপ নিষিদ্ধ করিবার কথা ভাবিতেছেন। শুধুমাত্র সরকারি স্তরেই নহে, বর্তমান প্রজন্মকে এইপ্রকার ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতার প্রয়োজন রহিয়াছে।

সুভাষিতম্

সমাজৈক্যম্ অভীষ্টম্ নো বৈষম্যেন ন সাধ্যতে।
সমাজ সমরস্যাদ বৈ নান্যঃ পন্থা হি বিদ্যতে।।

সামাজিক একতা যা আমাদের চির আকাঙ্ক্ষিত বিষয়, তা বৈষম্যমূলক ব্যবহারের দ্বারা লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। তার জন্য সামাজিক সমরসতা বিনা অন্য কোনো পথ নেই।

মতুয়া নয় মুসলমান ভোটের জন্য বাঙ্গলাভাগের ঠুলি পরানো হচ্ছে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিজেপির এক হবু বিধায়ক 'শৌচলয়ে যাচ্ছি' বলে ভোট কেন্দ্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এখন 'ত্রাণ দান' করেন। প্রত্যক্ষ আন্দোলন করতে ভয় পান। বিজেপির এক তরুণ নেতার দাবি, 'রাজ্য বিজেপিতে এই অযোগ্য নেতাদের কোনো স্থান নেই।' পলাতক নেতা বিজেপির জাতীয় কমিটি আর রাজ্য কোর কমিটির সদস্য। এই সব অপসৃত নেতাদের সুযোগ নিয়ে আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি। আগেও লিখেছি কেবল ঝোড়ো আন্দোলন টলাতে পারে মমতাকে। ত্রাণ, দান আর টিভি আলোচনায় তা হবে না। মমতার তৃণমূল দলের নেতাদের দুর্নীতির শিকড় অনেকটা গভীরে। তার নাগাল পেতে মমতাকেই হিমশিম খেতে হচ্ছে।

কার্ল মার্কসের ভাষায় মমতা সেই কাপালিক যে নিজের তৈরি দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ। তিনি দলে 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' তৈরি করেছেন। তার হাত থেকে বাঁচতে আজগুবি তত্ত্ব খাড়া করছেন। সংশোধিত নাগরিক আইন (সিএএ), এনআরসি বা এনপিআর-এর সঙ্গে বাঙ্গলাভাগের তত্ত্বকে গুলিয়ে দিচ্ছেন। রাজ্যের মানুষের চোখে ঠুলি পরানোর চেষ্টা করছেন। প্রধানভাবে উত্তরবঙ্গ আর চার জেলায় আনুমানিক তিন কোটি মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের চোখে। সিপিএম আর কংগ্রেস ঘোলাজলে মাছ ধরছে। কুন্নুরে সিপিএমের ২৩তম পার্টি কংগ্রেস সিএএ-কে 'বিভাজনকারী' বলা হয়েছে।

এরপর সিপিএমের কিছু বলার থাকে না। তবু তারা ঘোলাজলে খেলছে। মমতা সে সুযোগ করে দিচ্ছেন। সিপিএমের উত্থানে যে বিজেপির ক্ষতি মমতা তা জানেন। মমতা বলেছেন, 'মতুয়ারা নাগরিক। নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।' মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ বলছেন, 'না আমরা নাগরিক মর্যাদা পাইনি। আমাদের তা দিতে হবে'। মমতার দাবির সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। এটা প্রচার করা হচ্ছে উত্তরবঙ্গকে আলাদা করতে চায় বিজেপি। আশির দশকে গোর্খা আন্দোলনের সময় মমতার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ তুলেছিল সিপিএম। ৮০-র মাঝামাঝি তৈরি হয় গোর্খা পার্বত্য পরিষদ। রাজ্যের গলায় কাঁটা হয়ে আজও তা বিঁধে রয়েছে।

মতুয়া নয়, মমতার চোখ রাজ্যের ১২৮টি মুসলমান অধ্যুষিত আসন। সেখানে সমর্থন নিশ্চিত করা। ২০২১-এর রাজ্য ভোটে সংকল্পপত্রে 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ' গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে না পারলেও বিজেপির বাঙ্গলাভাগের কোনো প্রমাণ কাগজে-কলমে পাইনি। মমতা ঘনিষ্ঠ কিছু সাংবাদিক ভিত্তিহীনভাবেই অবশ্য তা নিয়ে 'গেল গেল' রব তুলেছেন।

নতুন নাগরিক আইনে সংশোধন— 'ধর্মীয়ভাবে নির্যাতিত সম্প্রদায়' এই কথাগুলির জন্য। তার মধ্যে মমতার ভোটব্যাংক প্রিয় সম্প্রদায় নেই। মমতা প্রমাণ করছেন তৃণমূলের দুটি ফুল— তুষ্টিকরণ আর দুর্নীতি।

বারো মাসের মধ্যে অন্তত আটবার উত্তরবঙ্গ সফর করেন মমতা। বিষয় থাকে উন্নয়ন। এরপরেও ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গে সাত আসন জিতে নেয় বিজেপি। তার মধ্যে সংখ্যালঘু মতুয়ারা রয়েছেন পাঁচ আসনে। আর ৫৪ বিধানসভা আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছিল ২৯ আসন। রাজ্যে মতুয়া আসন ২৯। সামনে পঞ্চায়েত ভোট। আমার মনে হয় না ৭৪ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে মাত্র ২০০০ গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের (১টি বিধানসভা = আনুমানিক ৪৫০-৫০০ গ্রাম আসন) জন্য মমতা এতটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আসলে ২০১৯ সংশোধিত নাগরিক আইনে যে বাঙ্গলাভাগের কোনো ব্লু প্রিন্ট নেই তা ভালোই জানেন মমতা। তাই সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের মতো তা নিয়ে নাটক করছেন।

২০১৯ লোকসভা সিএএ আইন পাশ হওয়ার পর রাজ্য জুড়ে কেন্দ্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস করা শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'বেশভূষা দেখে বোঝা যাচ্ছে কারা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নষ্ট করছে'। ২০১০ সালে মতুয়াদের নাগরিকত্বের দাবি তুলেছিলেন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য। বারো বছর পর তা বুমেরাং হবে বুঝতে পারেননি। ২০১০ -এর থেকে মমতার এখনকার অবস্থান আলাদা। নতুন নাগরিক আইনে সংশোধন— 'ধর্মীয়ভাবে নির্যাতিত সম্প্রদায়' এই কথাগুলির জন্য। তার মধ্যে মমতার ভোটব্যাংক প্রিয় সম্প্রদায় নেই। মমতা প্রমাণ করছেন তৃণমূলের দুটি ফুল— তুষ্টিকরণ আর দুর্নীতি। □

অখিল লজ্জায় বাংলা

ক্ষমাশীলা দিদি,

আপনি ক্ষমা করে থাকেন। কারও বাড়িতে কোটি কোটি টাকা পাওয়া গেলে বলে দেন, একজন ভুল করেছে। কেউ খুন করলে বলেন, এটা সাজানো ভুল। কেউ দুর্নীতিতে জড়িয়ে গেলে বলেন, ছোটোরা অনেক সময় ভুল করে ফেলে। আবার সবাই দুর্নীতিতে জড়িয়ে গেলে বলে দেন, কাজ করতে গেলে তো ভুল হবেই। সুতরাং, ক্ষমা করে দিতে হবে।

এবার আপনি ক্ষমা চেয়েছেন। আপনার বিধায়ক, আপনার মন্ত্রী, আপনার সৈনিক, আপনার সম্পদ অখিল গিরি যে অন্যায় করেছেন তার জন্য আপনি ক্ষমা চেয়েছেন। সে ক্ষমা চাওয়ায় কতটা রাজনীতি আর কতটা আন্তরিকতা সে প্রশ্ন তুলব না। তবে এই প্রথম আপনি কোনও কারণে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন।

কিন্তু এ লজ্জা তো শুধু আপনার নয়। যিনি বলেছেন তিনি রাজ্যের মন্ত্রী। তাই বাংলার সব মানুষেরই আজ ক্ষমা চাওয়ার দিন দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের অধিকারী দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে। ক্ষমা চাইতে হবে এই ভারতের আদি বাসিন্দাদের কাছে। ক্ষমা চাইতে হবে সেই সব মানুষদের কাছে যাঁরা জন্ম, ধর্ম, বর্ণ পরিচয়কে আড়ালে রেখে, সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে বসেছেন তাঁদের প্রতি। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে দ্রৌপদী মুর্মু হয়তো শুনতে পাবেন না আমার কথা। কিন্তু আজ একজন বাঙ্গালি হিসেবে আর এক বাঙ্গালির অপকর্মের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী।। বাঙ্গালিকে ক্ষমা করবেন রাষ্ট্রপতি। আপনাকে শুধু একটাই কথা বলব, সব বাঙ্গালি এক নয়। সবাই এমন অসম্মানের রাজনীতি করে না।

অখিল যে কথা বলেছেন সেটা আমি মুখে আনব না। কিন্তু মনে রাখব। কোনওদিন ভুলব না। মহামহিম রাষ্ট্ররতিকে অপমান করাই কি শুধু নাকি দিদি! এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আপনিও তো বারবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তুই-তোকারি করেন। কোমরে দড়ি পরানোর কথাও বলেছেন। শুধু কি প্রধানমন্ত্রী! এর আগে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির নাম নিয়ে আপনি ব্যঙ্গ করেছিলেন। জগৎপ্রকাশ নড্ডাজির পদবি নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'নাড্ডা, ফাড্ডা, গাড্ডা'। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর চেহারা নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। কিম্ভূতকিমাকার বলেছেন।

আমার মনে হয় অপমানের এই সংস্কৃতি আপনার দল তৃণমূল পেয়েছে কংগ্রেসের থেকে। কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী দ্রৌপদী মুর্মুকে 'রাষ্ট্রপত্নী' বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। আসলে এই রোগ তো আবার অধীরবাবু পেয়েছেন তাঁর আরাধ্য গান্ধী পরিবারের থেকে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ২০১৪ সালে অপমান করতে চেয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদীকে। তখন 'আব কি বার, মোদী সরকার' স্লোগান নিয়ে লড়ছে বিজেপি। উত্তরপ্রদেশ থেকেই প্রার্থী হবু প্রধানমন্ত্রী। গোটা দেশ জুড়ে প্রবল মোদী হাওয়া। মানুষ কংগ্রেস মুক্ত ভারত চাইছে। তখন মোদীকে কটাক্ষ করে 'নীচ রাজনীতি' বলেছিলেন উচ্চবর্ণের প্রিয়াঙ্কা। সেবার প্রিয়াঙ্কাকে জবাব দিয়েছিলেন মোদীজী। বলেছিলেন, 'আমাকে যত খুশি গালি দাও। দরকারে ফাঁসিকাঠে ঝোলাও। কিন্তু আমার মতো নীচু জাতের কাউকে অপমান করো না। আমার স্বপ্ন একটাই। এক ভারত, সেরা ভারত।' কিন্তু তাতেও আক্রমণ কমায়নি কংগ্রেস। পরে মোদীজী বলেন, 'সমাজের নীচু তলা থেকে এসেছি বলেই আমার রাজনীতি ওঁদের চোখে নীচ রাজনীতি বলে মনে হবে। নীচু জাতির মানুষের কতটা ত্যাগ, বলিদান ও চেষ্টায় দেশ আজ এই উচ্চতায় পৌঁছেছে, সেটা বোধহয় কিছু মানুষের নজরেই আসে না।'

> **আজ দ্রৌপদী মুর্মুকে তৃণমূল যে অপমান করেছে তা আসলে গোটা ভারতের অপমান। ভারতের মহান গণতন্ত্রকে অপমান। সংবিধানকে অপমান। সর্বোপরি দেশের জনজাতি সমাজকে অপমান।**

দিদি, আপনি তো জানেন, নীচ বলে অপমান করলে কী হয়? ২০১৪ সালে মোদীজীকে নীচ বলে অপমান করেছিল কংগ্রেস। ৩৪ বছরের দল বিজেপির কাছে প্রায় মুছে গিয়েছিল একশো বছরের পুরনো কংগ্রেস। উত্তরপ্রদেশে ৮০টা আসনের মধ্যে ৭১টা আসনে বিজেপি জয় পেয়েছিল। আর কংগ্রেস মাত্র দুটো। তাও সমাজবাদী পার্টির পায়ে ধরে ভোট ভাগ আটকে জিতেছিলেন গান্ধী পরিবারের মা ও ছেলে সোনিয়া-রাহুল।

তাই দিদি সাবধান। আজ দ্রৌপদী মুর্মুকে তৃণমূল যে অপমান করেছে তা আসলে গোটা ভারতের অপমান। ভারতের মহান গণতন্ত্রকে অপমান। সংবিধানকে অপমান। সর্বোপরি দেশের জনজাতি সমাজকে অপমান। তাই সেই দিন দূরে নেই। এই রাজ্যের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পিসি-ভাইপোকে কারও পায়ে ধরে জিততে হবে। কিন্তু জনজাতি সমাজ শুধু নয়, গোটা রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তৃণমূলকে ক্ষমা করবে না। □

অতিথি কলম

আর. জগন্নাথন

গুজরাটের নির্বাচনে বিরাট কোনও রাজনৈতিক উথালপাতাল হবে না

গুজরাটবাসী ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন দুই দশকের অধিককাল ক্ষমতাসীন বিজেপি দলের উচ্চকোটির নির্বাচনী প্রচার। একই সঙ্গে বিরোধী পক্ষও জল ঘোলা করে তুলতে খামতি দেখাচ্ছে না। এই গুজরাট নিশ্চিতভাবে বিজেপির সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ১৯৯৫ সাল থেকে প্রত্যেকটি বিধানসভা নির্বাচন জিতে দল সেখানে ক্ষমতাসীন। এবারের সমস্ত নির্বাচনী জয়ের উপকরণ আসন্ন ১ ও ৫ ডিসেম্বরের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মজুত করা হয়েছে যাতে অপরাজেয় কথাটা পুনর্বার সত্যি প্রমাণিত হয়। এটা সহজেই বোঝা যায় দলের সর্বোচ্চ নেতাদের মধ্যে নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের উপর্যপুরি গুজরাট সফরের মাধ্যমে। তাঁরা কোনো কিছুই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি নন।

এখন নির্বাচন ঘোষিত হয়ে যাওয়ার পর কয়েকটি বিষয় উঠে আসছে যে বিরোধীদের মধ্যে কে ভারতীয় জনতা দলের এই কয়েক যুগব্যাপী আধিপত্যে আঁচড় কাটতে পারবে? ঢক্কানিনাদ-সহ লড়াইয়ে আপ ও কংগ্রেস উভয়েই আছে। এই দুইয়ের মধ্যে আবার কার পাল্লা ভারী। একে ছোটো করে বললে বলা যায় আপ মানে এ, বিজেপি মানে বি আর কংগ্রেস মানে সি অর্থাৎ এককথায় গুজরাট ভোটের এ বি সি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে একটি সাম্প্রতিকতম বিষয় এম অর্থাৎ মোরভী সেতুর ভেঙে পড়া। এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় কিছু বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপি নিশ্চিতভাবে প্রথম পছন্দের কিন্তু 'আপের' ভোট শতাংশ কত হবে? কংগ্রেসকে মুছে ফেলা যায় না। একই সঙ্গে মোদী এখনও প্রচণ্ডভাবে জনতার ওপর প্রভাবশালী। সর্বশেষ মোরভীর সেতু বিপর্যয় মানুষকে কতটা প্রভাবিত করবে?

(১) আপ দলের প্রাপ্ত ভোট শতাংশ যদি আদৌ প্রভাব ফেলার মতো হয় সেটি অন্যতম নিয়ামক হয়ে দাঁড়াবে।

(২) মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে যদি এ-দলের দিকে নির্বাচকমণ্ডলীর পছন্দ দেখা যায় তবে সেটি কোন দলের ভোট ভেঙে আসবে— বি-এর না সি-এর। নাকি উভয়ের থেকেই আসবে? তাহলে তার অনুপাত কেমন হবে?

(৩) বি নির্বাচনে যদি সি-এর থেকে তুলনামূলকভাবে কম ভোট হারায় সেক্ষেত্রে তারা নির্বাচনে তুমুল জয় পাবে। তবে অবশ্যই এ এমন সংখ্যায় যদি ভোট পায় তারা একাই আসন বার করে নিতে পারবে সেক্ষেত্রে এ প্রশ্ন আসবে না।

(৪) এরই মাঝখানে দুঃখজনকভাবে মোরভী সেতু ভেঙে পড়ে ১৩৫ জনের মৃত্যু এবং বহু সংখ্যক মানুষের আহত হওয়ার বিষয়টি ফলাফলের ওপর কতটা চাপ সৃষ্টি করবে? সেটা নিতান্তই স্থায়ীভাবে হবে নাকি রাজ্যব্যাপী হবে। এই নিয়ে জনমন তোলপাড় করাতে সি ও এ উঠে পড়ে লেগেছে যাতে বি যথার্থই বিপদে পড়ে। এই কারণেই বিজেপি তার একান্ত নিজস্ব এম অর্থাৎ মোদীকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী সেখানে হতাহতদের বাড়িতে ও হাসপাতালে পরিদর্শনে গেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাট নির্বাচনের দাঁও উচ্চ কোটিতে পৌঁছে গেছে। কংগ্রেস মরণপণ চেষ্টা করবে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার। বিজেপি সর্বশক্তি নিয়োগ করবে এটা প্রমাণ করতে যে মোদীর দুর্গ অতীতের মতো আজও দুর্লঙ্ঘ্য। অন্যদিকে সদা হুংকার তোলা আপের চেষ্টা থাকবে কঠিন রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রেও কে জয় পেতে পারে সেটা প্রমাণ করার।

বাস্তবে ২০১৭ সালে বিজেপি কিন্তু ৯৯টি আসন (১৮২ টির মধ্যে) জিতে কঠিন হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মুখে পড়েছিল। ২০১২-র নির্বাচনে পাওয়া ১১৫ আসন থেকে সংখ্যা ১৬টি কমে গিয়েছিল। নজর করলে দেখা যায় যে বছর উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের প্রচণ্ড জয় পাওয়ার পর সম্ভবত দল কিছুটা বাড়তি আত্মবিশ্বাস ও নিশ্চয়তায় ভুগছিল। এই অভিজ্ঞতার পর দল এবারে আর কোনো কিছুকেই নিশ্চিত বলে ধরে নিচ্ছে না।

এ কারণেই দেখবেন গত মার্চ মাসে হেসে খেলে উত্তরপ্রদেশে জেতার পরই প্রধানমন্ত্রী সেই গরম নির্বাচনী ফলাফলকে পাথেয় করেই সঙ্গে সঙ্গে আমেদাবাদে 'রোড শো' করতে ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি ও অমিত শাহ জনতার মতিগতি কোনদিকে তা বুঝতে কোনো কসুর করেননি। সেই প্রক্রিয়ায় জনতার মধ্যে কোনো অসন্তোষ থাকলে তা আগেভাগে দূর করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই সূত্রে তিনটি বিশাল মাপের প্রকল্প (১) বেদান্ত-ফক্সকন সেমি কন্ডাক্টর, (২) এয়ারবাস টাটা সামরিক পরিবহনের উড়োজাহাজ, (৩) আরসেলর-মিত্তল-নিপ্পন ইস্পাত কোম্পানির ব্যাপক সম্প্রসারণের বহু হাজার কোটি টাকার চুক্তি সম্পাদিত হয়।

অন্য মানসিক প্রভাব বাড়াতে অযোধ্যা দীপোৎসব এবং জমিতে দাঁড়িয়ে 'প্রধানমন্ত্রী রোজগার মেলা'র মাধ্যমে হাতে হাতে চাকরি দেওয়া হয়। মোদী জমানায় চাকরি ও অর্থনৈতিক উন্নতি হাতে হাত মিলিয়ে চলেছে, জনমনে সরাসরি এমন বার্তাই দেওয়া হয়। আর হিন্দু আস্থা সংরক্ষণের বিষয়টি তো ভারতব্যাপী মন্দির ও ধর্মস্থান জীর্ণোদ্ধার প্রকল্পের মাধ্যমে ঘটেই চলেছে।

একেবারে গুজরাটের নিজস্ব রাজনৈতিক সমীকরণে ভারসাম্য ঠিক রাখতে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানীকে (যাঁর প্রশাসনিক প্রভাব আদৌ নজরকাড়া ছিল না) সরিয়ে শক্তিশালী প্যাটেল সম্প্রদায় থেকে ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। কিন্তু এর মাধ্যমে এটা কখনোও ধরে নেওয়া যায় না যে বিজেপি সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র কোনো গড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অবস্থান করছে। কেননা সেই 'আপ'-এর আগমন ও মোরভীর বিপর্যয়। আপ গুজরাটে গত বছর নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ নিয়ে সুরাটের পৌর নির্বাচনে ২৭টি আসন জিতেছিল। চূড়ান্ত ফলাফলের দিক থেকে বিজেপি ৯৩টি আসন এবং আপ উল্লেখিত আসন জিতলেও সুরাটের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহুরে এলাকায় কংগ্রেসের ধুয়েমুছে যাওয়ায় এমনই ইঙ্গিত ছিল যে মানুষ নতুন কিছু চাইছে। হয়তো-বা বদল চাইছে। তবে এমন নির্বাচনী অনুমান করা মহা নির্বোধের কাজ হবে যে সুরাট নগর পালিকার এই ফলাফল সমগ্র রাজ্যের ফলাফলের আগাম সংকেত। কিন্তু এটা অবশ্যই একটা ধারণা দেয় শাসক বিরোধী ভোটের অংশ কংগ্রেস ও আপের মধ্যে বেশ খানকটা ভাগ হতে চলেছে। কিন্তু এখন বিভাজন যদি রাজ্যব্যাপী ঘটে সেক্ষেত্রে সামগ্রিক লাভ হবে বিজেপিরই। তবু এই ধরনের উপসংহার অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে।

(১) রাজ্যের গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে কংগ্রেসের মজবুত ভিত্তি ও সংগঠন আছে। এর মধ্যে জনজাতি অঞ্চলও পড়ে। এখানে আপ দলের ছিটেফোঁটা প্রভাব নেই।

(২) এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত শক্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া আহাম্মকের কাজ হবে। একই 'আপ' কেবলমাত্র কংগ্রেসের ভোটেই ভাগ বসাবে বিজেপির নয় এমন অনুমানও ন্যায়সঙ্গত নয়।

(৩) একটি শহুরে দল যারা ভারতের সম্পূর্ণভাবে একমাত্র সিটি স্টেট দিল্লিতে দু'বার ক্ষমতাসীন হয়েছে তাদের শহুরে এলাকায় নিশ্চিতভাবে একটা প্রভাব থাকবে এটা ধরে নেওয়া যায়। চিন্তার কারণ হয়েছে গুজরাটের উন্নত শহরাঞ্চলগুলিতে বিজেপির দীর্ঘকালের আলাদা প্রভাব রয়েছে। এখানে টক্কর দেওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এবিপি 'সি' ভোটার ভোটপূর্ব বিশ্লেষণ ও আগাম সমীক্ষায় বিজেপির বিপুল জয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে। অবশ্যই তাতে দলের ভোট শতাংশ আগেরবারের চেয়ে কিছুটা কম দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে সমীক্ষা আপ ও কংগ্রেসের মধ্যে ভোট ভাগাভাগির ওপরই জোর দিয়েছে। ভোট পূর্ববর্তী নির্বাচনী ফলাফলের বিশ্লেষণ মাঝে মাঝেই ভুল হয়। কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিতভাবে উঠে আসছে যে আপের প্রভাব ও ভোট ক্রমবর্ধমান। ২০২৪ সালে তাদের এই বারের নির্বাচনী ফলাফল ইতিবাচক হলে কী প্রভাব পড়তে পারে সেগুলিও বিবেচনার বিষয়।

যদিও এটা নিশ্চিত যে গুজরাটে কোনো বিশাল রাজনৈতিক উথালপাতাল হবে না। কিন্তু লোককে সাময়িক ধোঁকা দেওয়ার কাজ চলতেই থাকবে। ক'দিন আগেই আপ হিন্দু ভোটারদের ভুল বোঝাতে নতুন বেড়াল বার করেছে— টাকার ওপর লক্ষ্মী-গণেশের ছবি ছাপানো দরকার। কংগ্রেস 'আপে'র পথ অনুসরণ করে নতুন নতুন দান খয়রাতি ঘোষণা করতে পারে। যেমন একেবারে মুফতে জল, আলো। এগুলি সামগ্রিক অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করলেও রাজনৈতিক লাভকারী।

তবে তিন ঘোড়ার দৌড় সর্বদা চিত্তাকর্ষক এমনকী ফলাফলের মোটামুটি একটা আন্দাজ থেকেও থাকে। তবুও ৮ ডিসেম্বরের ফলাফল আমাদের এই আন্দাজ নিশ্চিত দেবে যে মাটির তলায়, জলের তলায় Tectonic plate-এর চলাচল হচ্ছে কিনা? যা ভবিষ্যতে বাড়লে প্রাকৃতিক ভূমিকম্প বা জলোচ্ছ্বাস ঘটে। রাজনীতির অন্তঃসলিলা গতি কোন দিকে তা বোঝার সুযোগ এই নির্বাচনী ফলাফলে থাকবে। □

শোকসংবাদ

হাওড়ার অতি প্রবীণ স্বয়ংসেবক পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৯ নভেম্বর শিবপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে শিবপুরে তথা হাওড়ায় সঙ্ঘকাজের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই তিনি স্বয়ংসেবক। মূলত নবতিপর পঞ্চাদার স্মৃতিকথনকে ভিত্তি করে সম্প্রতি 'গোড়াপত্তন' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। বয়সের ভারে স্মৃতিদৌর্বল্যের কারণে কিছু খামতি সত্ত্বেও পঞ্চাদার লেখাটি ভবিষ্যতে হাওড়ার সঙ্ঘকাজের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার অন্তত একমেটে হয়ে থাকবে। তিনি জীবনভর সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। কোনো কারণে হাওড়ার প্রবীণ স্বয়ংসেবকরা তাঁকে 'ক্যাপ্টেন পঞ্চাদা' বলে ডাকতেন। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অনুগামী ও ঋত্বিক ছিলেন। শেষদিন পর্যন্ত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তারূপে প্রতি বছর দোলের দিন নিষ্ঠার সঙ্গে নগর সংকীর্তনের আয়োজন করতেন। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। তিনি ২ পুত্র, ৩ কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড নম্বর সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে দেশপ্রেমের রাজনীতিই একমাত্র সম্বল

ক্রিকেট মাঠে ভারত-পাক দ্বৈরথের বিষয়টি চিরকালীন। তা চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকবেও। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে শত্রুতা করে আসছে, সেই সূত্রে ভারতের শত্রুদেশ হিসেবে পরিগণিত। তার রেশ পড়েছে খেলার মাঠেও। দেশের স্বার্থ ভারতীয় রাজনীতিতে কখনোই অগ্রাধিকার পায়নি। তাই রাজনৈতিকভাবে যার অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, খেলার মাঠে পাকিস্তানকে ভারত হারালে নিজেকে ভারতবাসী বলে মনে করা ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতেন। তবু যে গলার কাঁটাটা খচখচ করে আমাদের বিঁধতো, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে; এখানকার একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ক্রিকেট খেলায় জিতলে সেই এলাকাগুলিতে পটকা ফাটিয়ে আনন্দ করতে দেখা গিয়েছে। নব্বইয়ের দশকে এই বিপজ্জনক প্রবণতাই উল্লিখিত এলাকাগুলিতে হিন্দুদের হাল শোচনীয় করে তুলতো। দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্বের স্বার্থেই ওই বিপজ্জনক প্রবণতা অনেকদিন আগেই রোধ করা উচিত ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে একে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংখ্যালঘু অধিকার, ক্রিকেটকে খেলার জায়গায় রাখার দাবি ইত্যাদি হাস্যকর অপযুক্তির মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান জিতলে ভারতের বুকে বসে তাকে উদ্‌যাপন করাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থের কোনো বদল হয়নি। তাই ক্রিকেটের মাঠে হলেও এই দেশ-বিরোধী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। সময়ে পদক্ষেপ না করলে তার কী করুণ পরিণতি হতে পারে সদ্যসমাপ্ত টি-২০ বিশ্বকাপ তার প্রমাণ রেখে গেল।

গ্রুপের খেলায় ভারত পাকিস্তানকে পর্যুদস্ত করেছিল। জয়টা অবশ্য সহজ ছিল না। কিন্তু বিরাট কোহলির অনবদ্য ব্যাটিং ও হার্দিক পাণ্ডিয়ার সঙ্গে তার জুটি ভারতকে কিছুটা অবিশ্বাস্যভাবে জিতিয়ে দেয়। বিশেষ করে গত দুবাই বিশ্বকাপে হারের বদলা হিসেবে ভারতের এই জয়কে দেখা হয় এবং পাকিস্তানের হারকে সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো উদ্‌যাপন করা হয়। ধরেই নেওয়া হয়েছিল, ভারত যে ফর্মে খেলেছে তাতে এবারের অস্ট্রেলিয়ায় আয়োজিত টি-২০ বিশ্বকাপ জেতা ভারতের উচিত ছিল। কিন্তু সেমিফাইনালে পাকিস্তানের জয় এবং ইংল্যান্ডের কাছে ভারতের হার সব সমীকরণ বদলে দেয়। আনন্দের এই জোড়াফলার উদ্‌যাপন শুরু সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে। ভারতের হারকে কেন্দ্র করে শুরু হয় টিপ্পনী এবং পাকিস্তানের জন্য বিশ্বকাপ জয়ের আগাম শুভেচ্ছা। এমনকী এই আবেদনও করা হয় যে এশীয়দেশ হিসেবে প্রত্যেক ভারতবাসীর উচিত ফাইনালে পাকিস্তানকে সমর্থন করা এবং ফাইনালের অন্যতম প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের হার কামনা করা কারণ তারা এককালে ভারতকে শোষণ করেছে, এই যুক্তিতে। অর্থাৎ এককালে পাকিস্তানের জয়ের আনন্দ বিশেষ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যেখানে সীমাবদ্ধ থাকতো, নেহরুমুখী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জলহাওয়ায় তা পরিপুষ্ট হতে হতে এখন তথাকথিত 'সেকুলারবাদী হিন্দু'রাও পাকিস্তানের সমর্থক হয়ে উঠছে।

এই ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, কোন বিপজ্জনক বাঁকের মুখে পৌঁছে গিয়েছে ভারতের রাজনীতি, আর কোন খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে দেশের সার্বভৌমত্ব। বিরোধীরা প্রায়শই বুলি আওড়ান, দেশ-বিরোধিতা আর দেশের সরকার-বিরোধিতা এক জিনিস নয়। কিন্তু এই প্রচারের মুখোশের আড়ালে তাদের দেশ-বিরোধী মুখোশটা আরও একবার দেশের মানুষের সামনে উন্মোচিত হলো। রাজনৈতিক নেতৃত্ব হয়তো জনসচেতনতার কারণে কয়েক বছর আগের জেএনইউয়ে আফজল গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালনের মতো হঠকারী কোনো মন্তব্য করে বসেননি, কিন্তু তাঁদের রোপিত বিষবৃক্ষ কতটা পরণত হয়েছে, অত্যন্ত ভয়াবহতার সঙ্গে দেশবাসী তা লক্ষ্য করলো। কিন্তু এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? এককথায় আমাদের স্বাজাত্যবোধকে জাগ্রত করা তোলা। আমরা জানি, বালিতে মুখ গুঁজে থাকলে প্রলয় থেমে থাকে না। আমরা যদি এই দেশদ্রোহিতার প্রলয় দেখেও যদি চুপ করে থাকি, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অপরাধী হয়ে থাকবো। একথা আমাদের বুঝতে হবে, দলমত-নির্বিশেষে নেহরুর রাজনীতির ঘেরাটোপ থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। এটা কোনো দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণ রাজনীতির কথা নয়, কিন্তু যে রাজনীতি আমাদের দেশভাগ করেছে, দেশভাগের পর সম্পূর্ণ জনবিনিময় হতে না দিয়ে হিন্দুর অস্তিত্ব সংকটগ্রস্ত করেছে, কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি করে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাব্যবস্থাকে সংকটগ্রস্থ করেছে সেই নেহরুপন্থী রাজনীতিকে দলমতপথ নির্বিশেষে বর্জন করতেই হবে। এর প্রতিকল্পে দেশপ্রেমের রাজনীতিই হোক আমাদের চালিকাশক্তি। □

উপনির্বাচনের ফলাফলে বিরোধীদের বিপদঘণ্টা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যেকটি উপনির্বাচনের ফলাফল সর্বদা কোনো সুদূরপ্রসারী সংকেত বহন করে আনে এমন নয়। অনেক সময়ই এমন কথা বলা হয় যে এর সঙ্গে বৃহত্তর রাজ্য নির্বাচন বা কেন্দ্রীয় নির্বাচনের ভবিষ্যৎ অন্বেষণ করতে যাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু বিগত ৩ নভেম্বর ৭টি কেন্দ্রের উপনির্বাচন ভৌগোলিকভাবে মোটামুটি ছিল ভারতব্যাপী। উত্তরে গোলা গোকর্ণনাথ বা আরও এগিয়ে হরিয়ানার আদমপুর, দাক্ষিণাত্যের তেলেঙ্গানার মনুগোড়ে থেকে পূবের ওড়িশার ধামনগর বা বিহার। পশ্চিমের আন্ধেরি পূর্ব— এই ভাবে প্রায় সারা ভারতের নির্বাচক মণ্ডলীর ভাবনা স্তরের একটা নমুনা পাওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ এখানে ছিল। তবে নির্বাচনী ফলাফলে হার-জিতের বাইরেও কিছু অন্তর্নিহিত সংকেত বিশেষ করে সারা দেশকেন্দ্রিক নির্বাচনে অবশ্যই থেকে যায়। যেমন—

(১) তেলেঙ্গানার মনুগোড়েতে সোনা দানায় শোভিত পারিবারিক দল তেলেঙ্গানার টিআরএস (বর্তমানে নামে হয়তো কিছু রদবদল হয়েছে)-এর চন্দ্রশেখরের বুকে বিজেপি কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন ও অন্য একটি উপনির্বাচনে জয় পাওয়ায় চন্দ্রশেখরের আশঙ্কা তো ছিলই তা এবার ঘনীভূত হলো। কেননা আগামী বছর এখানে বিধানসভার নির্বাচন। গত বিধানসভায় বিজেপির নগণ্য ৮ শতাংশ ভোট আজ তুল্যমূল্য লড়াইয়ের জায়গায় এসে গেছে। বিজেপি ১০ হাজারের কিছু ভোটে হেরেছে। গত বারের বিজয়ী কংগ্রেস মুছে গিয়ে নেমে গেছে তৃতীয় স্থানে। আগামী নির্বাচনের জন্য এটি বিপুল ইঙ্গিতবাহী।

(২) বিহারের গোপালগঞ্জ লালু-রাবড়ির আদি নিবাস। শ্বশুরবাড়ির তরফে সাধু যাদব বিএসপি-র হয়ে লড়েওছিলেন। এর আগে নীতীশকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপি এখানে জয় পেয়েছিল। এবারে ব্যবধান কমলেও জয় বিজেপি-রই হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আরজেডির কৃপায় নীতীশ মুখ্যমন্ত্রী হলেও তাঁর অ-যাদব ওবিসি ভোটাররা সেটা হয়তো খুব সম্মানজনক মনে করেনি। এখানে আগেরবারের থেকে জয়ের ব্যবধান কমলেও নীতীশের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া আরজেডি প্রার্থীর (জাতপাতের হিসেবে ৮০ শতাংশ ভোট) বিপুল ভোটে জেতা কাম্য ছিল। তা হয়নি। নীতীশ ২০১৫ সালের দল বদলে মহাজোট করার ফলাফল মাথায় রেখে লড়েছিলেন। ফলাফলে প্রমাণ হয়েছে তাঁর সমর্থন ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। একই বিষয় মোকামার ক্ষেত্রেও হয়েছে। সেখানকার অস্ত্র মামলায় আসামি জেলবন্দি অনন্ত সিংহের যোগ্য স্ত্রী নীলমদেবী গতবারের আসামি অনন্তবাবুর থেকে অর্ধেক ১৭০০০ ভোটে জিতেছেন। বিজেপি ৩০ বছরের মধ্যে প্রথম এই কেন্দ্রে লড়ে ৭০ হাজার ভোট পেয়েছে। এটি ভবিষ্যতের অশনিসংকেত। মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সুষম সুবিধে বণ্টনের প্রকল্পগুলি প্রভাব ফেলছে। জাতপাতের বাইরে তারা ভোট দিচ্ছে। ১ মাস আগে যে তিনজন মোদীকে সরিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার দিবাস্বপ্ন দেখছিলেন তাঁদের মধ্যে এই সুশাসনবাবু নীতীশ অন্যতম। স্বপ্ন দেখা খারাপ নয় আর রাজনীতি করলে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু কালকের দল আজ ছেড়ে দেওয়া আবার পরশু তাকেই কুকথা বলে পুরনো দলে ফিরে আসা এমন শুধুমাত্র ক্ষমতালোলুপ ব্যক্তির সমগ্র দেশ পরিচালনার স্বপ্ন কুস্বপ্ন, এই জন্যেই তা দেশের পক্ষে সর্বনাশা। তা বুঝেই নির্বাচকরা তাঁর দলকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

(৩) ওড়িশার সুশিক্ষিত, সুভদ্র মুখ্যমন্ত্রী ওড়িয়া ভাষা না জেনেও তাদের অকাতরে সমর্থন পেয়ে আসছেন। এখানের ধর্মনগর আসনটি বিজেপির অধিকৃত থাকলেও এবারে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নবীনের ভোট ২০১৯-এর ৪৫ শতাংশ থেকে ৪৩ শতাংশে নেমেছে।

(৪) আন্ধেরিপূর্ব কেন্দ্রে অত্যন্ত শ্রীয়মাণ উদ্ধব ঠাকরে একটি ওয়াক ওভার পেয়ে

সাময়িক মানসিক জোর হয়তো সংগ্রহ করবেন। এই কেন্দ্রে শিবসেনার পূর্বতন বিজয়ীর মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী সহানুভূতি ভোট পাবেন এমনটা ধরে নিয়ে মানবিক কারণে বিজেপি বা শিবসেনার ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী কেউই প্রার্থী দেয়নি। কার্যত এটিকে নির্বাচনী লড়াই সেভাবে বলাও যায় না। ঠাকরের প্রার্থীর সঙ্গে নোটা ১২৮০৬টি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে। তারফলে ভোটের ফলাফলকে বিজেপির পক্ষে ৬ এ ৪ এমনটা ধরাই ন্যায়সঙ্গত।

(৫) এবারে উত্তরপ্রদেশের গোকর্ণনাথ কেন্দ্রের প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা খুব সামনেই আবার নির্বাচন। মুলায়ম মারা যাওয়ার পর মৈনীপুরী লোকসভা কেন্দ্র খালি হয়েছে। এদিকে রামপুরে জমি মাফিয়া আজম খান বিচারকের আইন মেনে ৩ বছর জেল খাটার সাজা পাওয়ায় বিধায়ক পদ খুইয়েছেন। সেখানেও উপনির্বাচন আসন্ন। এই গোকর্ণনাথ আসনের মধ্যেই প্রচারের আলোয় আসা লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের বিপুল প্রচারিত হিংসার প্রসঙ্গ ছিল। এই ৩৪ হাজার ভোটের বিধ্বংসী জয় প্রমাণ করল পঞ্জাব ছাড়া কৃষকদের (আসলে বড়ো জোতদার) আন্দোলনের কোনো ভিত্তিভূমি নেই। এই ফলাফলের পর রামপুরের বিধানসভা নির্বাচন নিশ্চিতভাবে অখিলেশকে আতঙ্কিত করে তুলবে। কয়েক মাস আগেই আজমের লোকসভা আসনে বিজেপি জিতেছে। মুলায়মের রাজনৈতিক কর্মভূমি সইফাই, আজমগড়, এটাওয়া, মৈনপুরী এসব জায়গাতেও বিজেপি ক্রম সম্প্রসারমান। কয়েকমাস আগেই বিজেপি আজমগড় দখল করেছে। এক সময় গাভাসকর সব আকর্ষণ টেনে নিতেন, এলেন কপিলদেব। তারপর ধোনী থেকে বিরাট কোহলী। চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়। বিশেষ করে জমিদারি ভাবনা পোষণ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভোটে আর হবে না। ওই জায়গাটা আমার মনসবদারি ওখানে কেউ দাঁত ফোটাতে পারবে না। সেদিন বিগত। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ এখন রাস্তা দেখাচ্ছে। অতি সম্প্রতি ২০১৩ সালের মুজফরনগর দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে আদালতের রায়ে বিজেপি বিধায়কেরও পদ চলে গেল। আইনের শাসন সেখানে এখন প্রতিষ্ঠিত। মানুষ যে এর পক্ষে ভোটের ফলাফল তার হাতে গরম প্রমাণ।

(৫) এবারে আসা যাক ৭টির মধ্যে শেষ হরিয়ানার আদমপুর বিধানসভা আসনটিতে। এখানে খুবই চিত্তাকর্ষক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিশ্রুতি ছিল। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে দলের জন্ম দিয়েই দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসার উৎকট বাসনা লালনকারী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জন্মস্থান ভিওয়ানির খুব কাছে। তিনি বাল্যপাঠ হিসারেই নিয়েছিলেন। এই সব বিষয় তুলে তিনি আদমপুর নির্বাচনকে ২০২৪-এর ট্রেলর বানিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি নিয়মমাফিক রাজা হরিশ্চন্দ্র সেজে ২০২৪ সালে ফিরে হরিয়ানাকে স্বর্গরাজ্য বানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমন প্রতিশ্রুতি তিনি ক'মাস আগে উত্তরাখণ্ডে হওয়া নির্বাচনেও দেন। সেখানে ৬৯টি আসনের মধ্যে আবার রেকর্ড করে ৬৭টি আসনে তাদের প্রার্থীদের জামানত জব্দ হয়। একই দুষ্কর্ম তিনি গোয়াতেও করেছেন। আদমপুরে তাঁর প্রার্থী ৪৩২০ ভোট পেয়ে (৩.৪২ শতাংশ ভোট) চতুর্থ স্থানে নেমে জামানত জব্দের নতুন রেকর্ড করে দেশকে স্বস্তি দিয়েছেন।

অবশ্য জামানত জব্দ করার রেকর্ড তাঁর বর্ণময়। তিনি সর্বদাই মোদীকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে চান। যে কারণে পৃথিবীর ইতিহাস বলতে পারব না তবে ভারতের ইতিহাসে যে রেকর্ড কখনো ভাঙা যাবে না সেই বিরল পরিসংখ্যান তাঁর কবজায়। ২০১৪ সালের নির্বাচনে তিনি দলের জন্মের বছর খানেকের মধ্যে সারা দেশ জয় করে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় ৪৩২টি লোকসভা কেন্দ্রে কিছু উটকো লোককে খাড়া করেন। যাদের মধ্যে ৪১৪ জনই জামানত হারায়। কোনো ক্ষেত্রীয় দল (আম আদমি পার্টি অবশ্যই দিল্লির যা একটি সিটি স্টেট, পূর্ণ রাজ্য নয়। সেখানকার স্থানীয় দল ছাড়া কিছু নয়) কখনও এত তাড়াতাড়ি এমন দুর্মর আশা পোষণ করে ফোকটে ক্ষমতা দখল করার অপচেষ্টা করেছে বলে জানা নেই। প্রত্যেক রাজ্যেই তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাজের মাধ্যমে দলকে পরিচিতি দিতে হয়। এই দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী অভিলাষীর শোচনীয় পরাজয় অবশ্যই দেশের পক্ষে হিতকর।

কেননা পুলওয়ামায় বিপুল সংখ্যক জওয়ানের সন্ত্রাসবাদী হামলায় মৃত্যুকেও তিনি মোদীর সৃষ্টি বলার বা বালাকোটে বোমা বর্ষণের প্রমাণ চেয়েছিলেন। ইনি কখনই যে দেশের মঙ্গল চান না সে প্রমাণ তিনি বারবার সুযোগ পেলেই দিয়ে ফেলেন। মনে রাখতে হবে, দেশের ৫৪৩ জনের সংসদে তাঁর দলের কোনো সদস্য নেই। তাঁর সামনে আবার দুটো রাজ্য জয় করে খয়রাতি শাসন প্রতিষ্ঠা করার হাতছানি। গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশ। তিনি তুমুল প্রচার করছেন। যা তিনি সঙ্গী পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবৎ মানকে নিয়ে জামানত জব্দ হওয়া আদমপুরেও করেছিলেন।

এসব দেখেশুনে ঘাবড়ে যাওয়া তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী আমাদেরই রাজ্যশ্রী। অবশ্য কেজরিওয়াল এখানে থাকলে কন্যাশ্রী, বন্যাশ্রীর সঙ্গে অনায়াসে একটা জব্দশ্রী পেতে পারতেন। তাঁর এ ব্যারাম সারার নয়। কেননা এখানে যেমন তোলাবাজি প্রচুর টাকা সরবরাহ করে, দিল্লিতে মদের বেআইনি কারবার, হাওয়ালা থেকে অর্থাগম হয়। এখানেও তাঁর রেকর্ড রয়েছে মন্ত্রী দীর্ঘদিন জেলবন্দি থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে মন্ত্রীপদে রেখে দিয়েছেন। জেলমন্ত্রী জেলবন্দি হয়ে অন্য বন্দিদের কাছ থেকে অঢেল টাকা তুলছেন বলে অভিযোগ। এ নিয়ে তুলকালাম হচ্ছে। এটিও একটি বিশ্ব রেকর্ড নিঃসন্দেহে।

ভারতের সজাগ নাগরিকরা এইসব বিচিত্র ক্ষমতালোলুপ ভণ্ডদের হাত থেকে দেশকে অক্ষত রাখার পর্যাপ্ত সংকেত এই উপনির্বাচনগুলিতে দিয়েছেন। এটা নিশ্চিত। দেশবাসী তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

শুভ জন্মদিন পুরুলিয়া

সৌম্যদীপ ব্যানার্জি

ইসলামিক বাংলাদেশের তথাকথিত মাতৃভাষা দিবসের চাপে বাঙ্গালি ভুলে গেছে বাংলাভাষার জন্য ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বৃহত্তম আন্দোলন 'মানভূম আন্দোলন'-এর নাম। মানভূমে বাংলাভাষা আন্দোলন ১৯১২ সালে শুরু হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ভাষা আন্দোলন তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে মানভূমের বাঙ্গালিদের মধ্যে। মানভূমের এই ভাষা আন্দোলন পৃথিবীতে ঘটা দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলন। ১৯৫৬ সালের আগে পুরুলিয়া জেলা বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময় রাজনৈতিকভাবে পুরুলিয়ার স্কুল-কলেজ, সরকারি দপ্তরে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সেই সময় জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে বাংলাভাষী মানুষ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার চেষ্টা করে; কিন্তু বাংলাভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় পুরুলিয়া কোর্টের আইনজীবী রজনীকান্ত সরকার, শরৎচন্দ্র সেন ও গুণেন্দ্রনাথ রায় জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক দল লোকসেবক সঙ্ঘ গড়ে তোলেন। এবং বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে তাদের সুদৃঢ় আন্দোলন শুরু করেন। এরপর ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার মানভূম জেলা ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে একটি নতুন জেলা হিসেবে পুরুলিয়া জেলা সংযুক্ত করতে বাধ্য হয়।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ আলম বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হলে তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিহার ওড়িশা সমেত সমগ্র বাঙ্গলার দেওয়ানি দিতে বাধ্য হন। কোম্পানি বাঙ্গলার জঙ্গলমহল এলাকায় কর সংগ্রহ করা শুরু করলে তারা প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এই এলাকাকে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্চেত, ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে জঙ্গল মহল এবং ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মানভূম এই তিন ভাগে ভাগ করেন। মানভূম জেলার সদর দপ্তর হয় মানবাজার। এই জেলা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাঁকুড়া জেলা ও বর্ধমান জেলা এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ধানবাদ, ধলভূম ও সেরাইকেলা খার্সোয়ান জেলার অংশ নিয়ে ৭,৮৯৬ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে তৈরি করা হয়। পরবর্তীকালে ১৮৪৫, ১৮৪৬, ১৮৭১ ও ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মানভূমকে আরও ভাগ করা হয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র মানভূম ও ধলভূম জেলাকে নতুন তৈরি বিহার-ওড়িশা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে ওই অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ জানালেও ওই সিদ্ধান্ত রদ হয়নি। জাতীয় কংগ্রেসের ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের নাগপুর অধিবেশনে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবি আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বিহারে জাতীয় কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব লাভ করার পর ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে 'মানভূম বিহারী সমিতি' নামে এক সংগঠন গড়ে ওঠে। এর বিপরীতে মানভূম জেলার বাঙ্গালিরা ব্যারিস্টার পিআর দাসের সভাপতিত্বে 'মানভূম সমিতি' নামে সংগঠন তৈরি করেন। বিহার সরকার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয় খুলতে শুরু করলে বাঙ্গালিরাও বাংলা স্কুল খুলতে তৎপর হয়ে পড়েন। এই সময় সতীশচন্দ্র সিংহ রাঁচি, পালামৌ, সিংভূম ও মানভূম জেলা নিয়ে ছোটোনাগপুর নামে এক নতুন প্রদেশ গঠন বা বাংলার সঙ্গে পুনরায় সংযুক্তির প্রস্তাব করেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের নীতির বাস্তব রূপায়ণের দাবিতে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিকতা বেড়ে উঠতে শুরু করে। সেই পরিস্থিতিতে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেশের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করেন এবং সেই হিসেবে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ কমিশন বা দার কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কমিশন মত দেয় যে, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস তার অতীত অঙ্গীকার থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এবং শুধুমাত্র ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন না করে ভারতের ঐক্যবদ্ধতাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এই কমিশনের প্রতিবেদন খতিয়ে দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও পট্টভি সীতারামাইয়াকে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি নিয়োজিত হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে তৎকালীন বিহার সরকার ওই রাজ্যের মানুষদের ওপর হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রাথমিক স্তরে ও সরকারি অনুদান যুক্ত বিদ্যালয়ে হিন্দি মাধ্যমে পড়ানোর নির্দেশ আসে, জেলা স্কুলগুলিতে বাংলা বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং হিন্দিকে বিহার রাজ্যের আনুষ্ঠানিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা কর হয়।

আন্দোলন :

মানভূম জেলার বাংলাভাষী মানুষদের ক্ষোভ আঁচ করে জেলা কংগ্রেসের মুখপত্র মুক্তি পত্রিকায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ হিন্দি প্রচার, বাংলা ভাষাভাষীদের বিক্ষোভ ও মানভূম জেলার বঙ্গভুক্তির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল বান্দোয়ান থানার জিতাল গ্রামে অতুলচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে জেলা কমিটির অধিবেশন হলে সেখানে প্রতিনিধিদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ওই বছর ৩০ মে পুরুলিয়া শহরের অধিবেশনে মানভূমের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব ৫৫-৪৩ ভোটে খারিজ হয়ে গেলে অতুলচন্দ্র ঘোষ-সহ সাঁইত্রিশজন জেলা কমিটি থেকে পদত্যাগ করে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন পাকবিড়রা গ্রামে লোক সেবক সঙ্ঘ তৈরি করেন। বিহার সরকার বাংলাভাষীদের প্রতিবাদসভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করলে মানভূম জেলায় আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। লোক সেবক সঙ্ঘ ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি টুসু সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে। হাজার হাজার বাংলাভাষী

মানুষ কারাবরণ করে। এই সময় বেশ কয়েকটি টুসু সংগীত জনগণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। তার মধ্যে দুটি হলো :

'শুন বিহারী ভাই
তোরা রাখতে পারবি ডাঙ দেখাই
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।'
'কোন ভেদের কথা নাই।
এক ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে,
মাতৃভাষায় রাজ্য চাই।
মোদের ভূমি মানভূমেতে
গড়িব রাম রাজ্যটাই।'

পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তি :

প্রবল আন্দোলনের ফলে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর ভারত সরকার সৈয়দ ফজল আলির সভাপতিত্বে, হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও কবলম পানিক্করকে নিয়ে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তৈরি করে। এই কমিশন ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে মানভূম জেলায় তদন্ত করে ওই বছর ১০ অক্টোবর তাদের বক্তব্য জমা দেন। তাদের বক্তব্যে মানভূম জেলা থেকে বাঙ্গালি অধ্যুষিত এলাকাগুলি নিয়ে ১৯টি থানা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলা নামে এক নতুন জেলা তৈরি করার প্রস্তাব দেন। তারা মানভূম জেলা থেকে ধানবাদ মহকুমার ১০টি থানা ও পুরুলিয়া মহকুমার ২টি থানা বিহার রাজ্যে রেখে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। অপরদিকে ধলভূম পরগনায় বাংলাভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকার করেও যেহেতু ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ ওই জেলায় বসবাস করেন সেই কারণে কমিশন জামশেদপুরকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করতে বা ধলভূম পরগনা ভেঙে পশ্চিমবঙ্গে আনতে রাজি ছিলেন না।

এই প্রস্তাবে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ থেকে ২০ জুন বোধীরা মানভুম জেলায় ধর্মঘটের ডাক দেন। অপরদিকে বাংলা ভাষা আন্দোলনকারীরা ধানবাদ বিহারের অন্তর্ভুক্তিতে খুশি ছিলেন না।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার উভয় রাজ্যের সংযুক্ত করে পূর্বপ্রদেশ নামে এক নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাবনা করেন। তারা প্রস্তাব দেন যে, ওই প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি ও বাংলা উভয়ই স্বীকৃত হবে, মন্ত্রীসভা, বিধানসভা, পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি করে থাকলেও হাইকোর্ট থাকবে দু'টি। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা ছাড়াও বামপন্থী দলগুলিও ছিল। দুই রাজ্যে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যে বিহার বিধানসভায় ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যায়। লোক সেবক সঙ্ঘের কর্মীরা ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল পাকবিড়রা গ্রাম থেকে বাঁকুড়া, বেলিয়াতোড়, সোনমুখী, পাত্রসায়র, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান, পাণ্ডুয়া, মগরা, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, হাওড়া হয়ে কলকাতা শহরের দিকে শান্তিপূর্ণ পদযাত্রা শুরু করে ৬ মে কলকাতা পৌঁছায়। ৭ মে মহাকরণ অবরোধের কর্মসূচি অনুসারে বি-বা-দী বাগ পৌঁছলে ৯৬৫ জন কারাবরণ করেন। এই ঘটনার তিন দিন আগে ৪ মে উভয় রাজ্যের সংযুক্তির প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট বাংলা-বিহার সীমান্ত নির্দেশ বিল লোকসভায় ও ২৮ আগস্ট রাজ্যসভয় পাশ হয়। ১ সেপ্টেম্বর এতে ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেন। এর ফলে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর ২৪০৭ বর্গ মাইল এলাকার ১১, ৬৯,০৯৭ জন মানুষকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নতুন জেলা পুরুলিয়া তৈরি হয়। ধানবাদ মহকুমা বিহার রাজ্যে রয়ে যায়।

মানভূম বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন 'মানভূম কেশরী' অতুলচন্দ্র ঘোষ। এছাড়াও লাবণ্যপ্রভা দেবী, ভবানী মাহাতোদের নেতৃত্বে সমগ্র মানভূমের বাঙ্গালিরা নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন। আজ থেকে প্রায় সাত দশক আগে বাংলা ভাষার দাবিতে লড়াইটা ছিল স্বাভিমানের। আজকের দিনে সেই ভাষা আন্দোলনকারীদের সবার চরণে শতকোটি নমস্কার জানাই। ◻

With Best Compliments from -

**A
Well Wisher**

বিশ্বে আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও ভারতের মুদ্রাস্ফীতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে

আনন্দ মোহন দাস

বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির ফলে রাস্তাঘাটে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে অহরহ নরেন্দ্র মোদীর মুণ্ডুপাত। এর মধ্যে রাজনৈতিক দাদাদের ভোটের তাগিদে বাস্তব স্থিতিকে অস্বীকার করে মোদীর বিরুদ্ধে জনগণকে প্রোরোচিত করে প্রচারের মাত্রাকে আরও বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা ভুলে গেছি দাম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির হার সবচেয়ে বেশি। প্রশাসনিক ভূমিকার উপরে যখন রাজনীতি প্রাধান্য পায় তখন এই অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। বাজারে নজরদারি বন্ধ থাকলে অসাধু ব্যবসায়ীরা তার ফায়দা লোটার চেষ্টা করে। তার ফলে জনগণ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি নিয়ে প্রকৃত অবস্থান জানা একান্ত আবশ্যক। সারা বিশ্ব অর্থনীতি যখন মুদ্রাস্ফীতির দাপটে কয়েক দশকের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে তখন মুক্ত অর্থনীতিতে ভারত তার ছোঁয়ার বাইরে থাকে কী করে? কিন্তু এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতের মুদ্রাস্ফীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক অর্থ

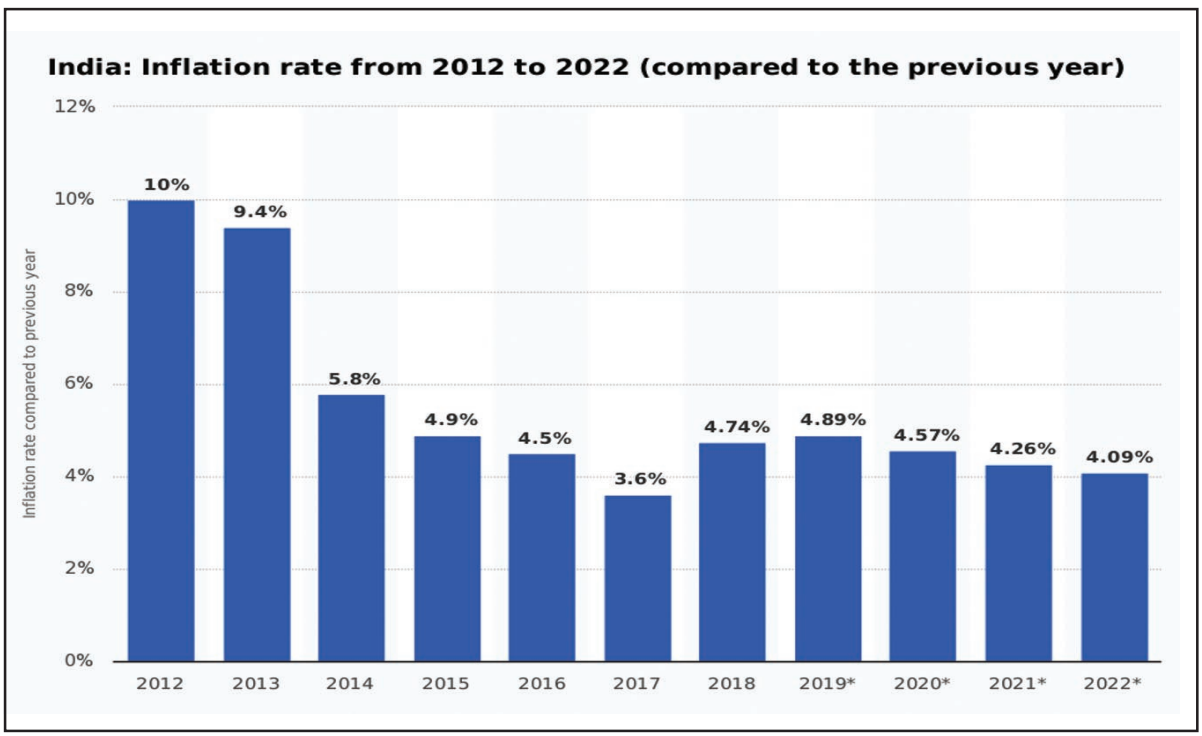

ভাণ্ডার (আইএমএফ) বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ গতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় বেশিরভাগ দেশেরই ২০২২ ও ২০২৩ অর্থবর্ষে আনুমানিক গড় জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার (জিডিপি) হ্রাস করে সংশোধন করেছে। এর পিছনে মূল কারণ হলো বিশ্বে সম্ভাব্য আর্থিক মন্দা ও অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতির হার। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ করোনাকালে অর্থনীতিকে বাঁচাতে বিপুল পরিমাণ আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক বাজারে টাকার জোগানে বৃদ্ধি এবং খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ার ফলেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। পরবর্তীকালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধিতে আরও সহায়ক হয়েছে। আবহাওয়া পরিবর্তন, কোথাও তাপপ্রবাহ, খরা ও বন্যার ফলে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন মার খেয়েছে। সবকিছু মিলে সারা বিশ্ব এখন চরম মুদ্রাস্ফীতির শিকার। এর ফলে বিশ্বজুড়ে দেশগুলি এখন মুদ্রাস্ফীতির দাপটে আর্থিক সংকটে ভুগছে। উন্নত দেশগুলি গত চার দশকের সবচেয়ে বেশি মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন। বিশ্বায়নের যুগে ভারতও মুদ্রাস্ফীতির মুখোমুখি। তবে বেশিরভাগ আর্থিক সমীক্ষার রিপোর্ট ও বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো তুলনামূলক ভাবে ভারতের অর্থনীতি অনেক মজবুত স্থানে অবস্থান করছে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। নীচে প্রদত্ত তথ্য থেকে বিভিন্ন দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি।

(১) আমেরিকা ৮.৩ শতাংশ।
(২) ইউরো এরিয়া ১০ শতাংশ।
(৩) ইংল্যান্ড ৯.৯ শতাংশ।
(৪) তুর্কি ৮৩.৫ শতাংশ।
(৫) আর্জেন্টিনা ৭৮.৫ শতাংশ।
(৬) পাকিস্তান ২৩.২ শতাংশ।
(৭) শ্রীলঙ্কা ৬৯.৮ শতাংশ।
(৮) জিম্বাবোয়ে ২৮০ শতাংশ।
(৯) লেবানন ১৬২ শতাংশ।
(১০) সিরিয়া ১৩৯ শতাংশ।
(১১) সুদান ১২৫ শতাংশ।
(১২) ভেনেজুয়েলা ১১৪ শতাংশ।
(১৩) ভারত ৭.৪ শতাংশ।

সূত্র মারফত জানা যায়, যে সমস্ত দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার সবচেয়ে বেশি, সেগুলি মূলত ভরতুকি নির্ভর অর্থনীতি ও বিনামূল্যে পরিষেবা প্রদানের কুফল। নোট ছাপিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে দেশগুলি চরম মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়েছে।

এই তথ্য অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাংকের নির্ধারিত মুদ্রাস্ফীতির হার লক্ষ্যমাত্রার (৬ শতাংশ) চেয়ে বেশি থাকলেও ভারতের মুদ্রাস্ফীতির হার বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের থেকে তুলনামূলক অনেক কম। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার আত্মসন্তুষ্টিতে না থেকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সময়ে সময়ে বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কখনো গম, চিনি ও চাল রপ্তানি বন্ধ রেখেছে। আবার ভোজ্যতেল, ডাল আমদানি করে জনগণের সুরাহা করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। রিজার্ভ ব্যাংকও সময়ে সময়ে সুদের হার বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, বেশ কয়েক দশক পর আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতি ভারতের চেয়ে বেশি রয়েছে। ১৯৮০ সালের পর এই প্রথম অর্থনীতির অধিকতম সংকোচন দেখা দিয়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে ইউএস ফেড মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ৩ শতাংশ সুদের হার বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে ইউরোপীয় দেশগুলি রাশিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় এনার্জি জোগানের অভাবে ভুগছে। ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থাও এই ছোঁয়ার বাইরে নেই। চলতি আর্থিক খাতে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানি কমেছে এবং দাম নিয়ন্ত্রণে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ঘাটতি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে। নতুবা আর্থিক ঘাটতি হ্রাস পাওয়া কঠিন ব্যাপার বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেশ কয়েকবার সুদের হার বৃদ্ধি করায় বিদেশি নিবেশকরা ঝুঁকিপূর্ণ শেয়ার বাজার থেকে টাকা তুলে আমেরিকায় সুদ বৃদ্ধির ফলে ঝুঁকিহীন বাজারে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়েছে। ফলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ কমেছে। সেজন্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং রিজার্ভ ব্যাংককেও ডলারের জোগান বৃদ্ধিতে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে হবে। ডলারের জোগান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। ডলারের বহির্গমন রুখতে ইউএস ফেড-এর সুদের হারের সঙ্গে সমতা আনতে সুদের হার বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা চলতি খাতে ঘাটতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়বে। এই ধরনের ঘাটতি মেটাতে বিপুল পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন হবে যা ইতিমধ্যেই জিডিপি অনুপাতে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সরকারকে এ বিষয়ে অধিক সচেতন হতে হবে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজ ছাড়া বিনামূল্যে পরিষেবা প্রদানের মানসিকতাকে বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবেই বিশ্ব মন্দা অর্থনীতির মধ্যে দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন। আশার কথা হলো, নরেন্দ্র মোদীর সরকার ইতিমধ্যে এ বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত হয়েছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের প্রধান ক্রিস্টলিনা জর্জিয়েভা আর্থিক সমীক্ষার রিপোর্ট পেশ করে ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং এ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মন্দা অর্থনীতির আবহে তিনি ভারতকে বিশ্ব অর্থনীতির এক স্বর্ণবিন্দু ও উজ্জ্বল তারকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা ভারত সরকারের কাছে এক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। □

বুনিয়াদি স্তরের রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সক্ষম করার একটি পথ

রবিরঞ্জন সেন

বিদ্যাভারতী হলো একটি অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান, একটি দেশব্যাপী সংগঠন। এর অধীনে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে শিশুমন্দির যোজনার মাধ্যমে এই সংগঠনের কাজে রত। দক্ষিণবঙ্গে ২০৫টি শিশুমন্দির ও বিদ্যামন্দিরে ২৩৩৫ জন আচার্য-আচার্যার (শিক্ষক-শিক্ষিকা) তত্ত্বাবধানে ৫০,০১৩ জন ভাই-বোন (ছাত্র-ছাত্রী) অধ্যয়ন করছে। একই সঙ্গে অনুন্নত এলাকায় ৩০টি সংস্কার কেন্দ্রে (অনৌপাচারিক বিদ্যালয়) ৭০৫ জন ভাই-বোন সংস্কার গ্রহণ করছে। সেইরূপ পরিষদের মার্গদর্শক বিদ্যাভারতীর পরিচালনায় দেশব্যাপী সমস্ত রাজ্যে ১২,৮৩০টি ঔপচারিক বিদ্যালয়ে ১.৫ লক্ষ আচার্য-আচার্যার পথনির্দেশে ৩৪.৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। এছাড়াও বিদ্যাভারতী সুদূর জনজাতি ক্ষেত্রে ৫০০০ একল বিদ্যালয় এবং সেবা বস্তিতে ৬৫০০টি সংস্কার কেন্দ্র পরিচালনা করছে।

কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা চিরপ্রতীক্ষিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি বুনিয়াদি স্তরে (প্রাক্ প্রাথমিক) রাষ্ট্রীয় পাঠক্রম কাঠামো-২০২২, রূপরেখা ২০ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান দ্বারা ঘোষিত হয়েছে। বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদ তথা বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। এই বিষয়ে বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের সভাপতি ডি রামকৃষ্ণ রাওয়ের প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করা হলো।

বিদ্যা ভারতীর প্রেস রিলিজ

বুনিয়াদি স্তরে রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (২০/১০/২০২২) রূপরেখা ঃ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অভিনন্দন।

মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান দ্বারা ঘোষিত (২০/১০/২০২২) বুনিয়াদি স্তরের জন্য রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো শুধুমাত্র ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য কেবল একটি অভিনব উদ্যোগ নয়, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও সক্ষম করার জন্য একটি পথও। এতদিন পর্যন্ত সরকারের দৃষ্টিতে বিদ্যালয় শিক্ষা প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত চলছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি-২০২২-এর অধীনে বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষাকেও বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সরকার অঙ্গনওয়াড়ি, বালওয়াাড়ি এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়েও প্লেওয়ে বা নার্সারি-কেজি নামে চলা শ্রেণীগুলিও এখন থেকে শিক্ষার একটি অংশ হিসেবে মানা হবে এবং এই সকল শিশুর জন্য রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো নির্ধারণ এবং তা ঘোষণা করার জন্য আমাদের কাছে সুবিধাজনক ও বহু প্রতীক্ষিত পদক্ষেপ বলে মনে হয়েছে।

শিক্ষার মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার ও উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি সুনির্দিষ্ট বিষয় এই পাঠ্যক্রম কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমটি হলো, শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ অর্থাৎ শুধুমাত্র পুস্তকে পড়া বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নয়। তার ব্যক্তিত্বের সমস্ত দিকের বিকাশ ঘটাতে হবে অর্থাৎ তার শরীরকে সুস্থ, শক্তিশালী, সুগঠিত ও নীরোগ করতে হবে। তার জীবনীশক্তি এবং শক্তির স্তর শক্তিশালী হওয়া উচিত। তার মন শান্ত ও একাগ্র হওয়া উচিত। তার বুদ্ধিমত্তা ন্যায়সঙ্গত হবে, যেমন— ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিষয়ে যেন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। এছাড়া নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রবণতা অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় একে পঞ্চকোষাত্মক বিকাশ বলা হয়ে থাকে। যার দ্বারা মানুষকে কেবল শরীর নয়, বরং শরীর-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-আত্মার সম্মিলন বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, সমগ্র বিকাশের সংকল্পনা। উপরোক্ত সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে, কিন্তু ব্যক্তি যদি আত্মকেন্দ্রিক থাকে তবে তার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়েছে বলা যায় না। মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে তার পরিবার, সমাজ, জাতি, মানবতা এবং সর্বোপরি সমগ্র সৃষ্টির প্রতি তার অনুভূতি ও দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। এই দিব্যবোধের বিকাশই শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদরা বিকাশের লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে ধারণা করতে সক্ষম। ইউনেস্কোও (UNESCO) এই উন্নয়নগুলি অর্জনের লক্ষ্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রসিদ্ধ অন্তঃরাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ ডেসার্স কমিশনও (১৯৯৬) প্রকারান্তরে এই বিষয়বিন্দুগুলির প্রতি সারা বিশ্বের শিক্ষাবিদ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিন থেকে ছয় বছর বয়সি শিশুরা এই দলে পড়ে। তাদের শিক্ষার জন্য প্রচলিত পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ, গৃহকার্য ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে সফল হতে পারে না। এই বয়সের শিশুরা তাদের মনমতো চলে। বিদ্যালয়ের অনুশাসন ও ব্যবস্থা জানে না বা বোঝে না। তাদের শেখানোর পদ্ধতি আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামোয় বিশেষভাবে যা নির্দেশ করেছে তা হলো খেলার মাধ্যমে, খেলনার মাধ্যমে এবং আনন্দ দিতে পারে এরূপ বিষয় শ্রেণী কক্ষে এবং মাঠের কার্যক্রমের মাধ্যমে শেখানো। এতে শিশুরা শিক্ষাকে বোঝা না ভেবে আনন্দের সঙ্গে শিখবে। মুখস্থ পদ্ধতিতে শেখানো এড়িয়ে চলতে হবে। এতে তাদের মনে যে ভয়ের সঞ্চার হয় এরূপ বিষয় থেকে তারা রক্ষা পাবে। প্রকৃতপক্ষে পড়াশোনায় ভয় পাওয়া এই শিশুরা পরে বিদ্যালয় ত্যাগ করে থাকে।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর এবং ১৯৮৬ সালে ঘোষিত শিক্ষানীতির ৩৫ বছর পর ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষণ দৃশ্যমান হচ্ছে। বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় সংস্থান গত ৭০ বছর শিক্ষাক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা একটি সংস্থা। ২০/১০/২০২২ তারিখে ঘোষিত বুনিয়াদি স্তরের জন্য রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম কাঠোমো-২০২২ ঘোষণার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই। এছাড়া রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি-২০২০ খসড়া প্রস্তুত করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ ড. কস্তুরীরঙ্গন এবং তাঁর পুরো দলকে অভিনন্দন জানাই। পাশাপাশি আমাদের সংস্থা এটির বাস্তবায়নে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাসও দিচ্ছে।

ডি রামকৃষ্ণ রাও, সর্বভারতীয় সভাপতি

বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান।

কেষ্ট ও তাঁর কন্যার লক্ষ্মীলাভে নজরে লটারি

বিশ্বপ্রিয় দাস

পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি লটারি নিয়ে বেশ কিছু শোরগোল ও সাড়া ফেলা ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ এক অলীক আশায় লটারির টিকিট কেনেন। পুরস্কার আর হঠাৎ বিত্তশালী হবার স্বপ্ন তাঁদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। কোটি কোটি মানুষ ছুটে যান লটারির টিকিট কেনার নেশায়। ক্বচিৎ কারও ভাগ্যে জোটে সেই সুযোগ। বাকিদের হতাশা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এটাকে একটা নেশার তকমা দিলেও ভুল হবে না।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, ভারতে লটারি কি বৈধ? তাঁদের উত্তরে বলি, হ্যাঁ। তবে এই লটারির পিছনে লুকিয়ে থাকা বেশ কিছু বিষয় হয়তো বৈধ নয় বা এই লটারিকে কেন্দ্র করে বেআইনি কাজকর্ম কিন্তু বৈধ নয়।

ভারতের বর্তমানে ১৩টি রাজ্যে লটারি বৈধ। এগুলি 'দ্য লটারি রেগুলেশন অ্যাক্ট-১৯৯৮ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতার আগে ১৮৬৭ সালে একটা আইন তৈরি হয়েছিল। সেটা সেরকম কাজের হয়ে ওঠেনি বা সেটা দিয়ে নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা যায় না। তবে রাজ্য সরকার পরিচালিত লটারিগুলিকেই মান্যতা দিয়েছিল। যে ১৩টি রাজ্য এই মান্যতার আওতায় ছিল, সেগুলি হলো, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, পঞ্জাব, গোয়া, মিজোরাম, সিকিম, মণিপুর, অরুণাচল, মেঘালয়, মধ্যপ্রদেশ, অসম ও নাগাল্যান্ড। কর্ণাটক মান্যতা পেলেও পরবর্তীকালে লটারিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পশ্চিমবঙ্গে স্টেট লটারি চালু হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। মাসিক লটারি ছাড়াও, বেশ কিছু উৎসবকে কেন্দ্র করে লটারি (বাম্পার ড্র) হতো বা হয়। ইদানীংকালে একটি লটারি পরিচালক প্রতিষ্ঠান সমস্ত রাজ্য সরকারি লটারিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর সেই লটারির মায়াজালে সর্বস্বান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এমনটাই মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

করোনার কারণে মানুষ যখন একেবারেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত ঠিক সেই সময়েই আবির্ভাব এই লটারির। সকাল-বিকেল- সন্ধ্যে এই তিন সময়ে লটারির টিকিট বিক্রি পাড়ার মুদি দোকানেও ঢুকে পড়ে। আমাদের রাজ্যে অন্য ব্যবসার বা শিল্পের প্রসার না ঘটলেও, লটারি মায়াজালের বিস্তার ঘটে। আর পাড়ার মোড়ে মোড়ে, গলিতে গলিতে আজ দেখা মিলছে এই বিশেষ একটি এজেন্সির লটারির দোকান। অথচ ডেইলি লটারি টিকিট বিক্রি কিন্তু নিষিদ্ধ। এই বিষয়টাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নানা উপায়ে, নানা নামে আজ পিছনের দরজা দিয়ে চালু রয়েছে সেই ডেইলি লটারি সিস্টেম।

সম্প্রতি বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর একটি উক্তি বেশ সাড়া ফেলেছে। সংবাদমাধ্যমে সেই উক্তি বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। বিষ্ণুপুরের এই বিজেপি সাংসদ অভিযোগ এনেছেন যে আমাদের রাজ্যের শাসক দলের যুবরাজ নাকি সপ্তাহে ১০ কোটি টাকা তোলা তোলেন ওই লটারি সংস্থার কাছ থেকে। এভাবেই নাকি মাসে ৪০ কোটি টাকা আসে। এই লটারি নিয়ে ইতিমধ্যেই এক চাঞ্চল্যকর বিষয় সিবিআইয়ের নজরে এসেছে। এই বিশেষ লটারি থেকেই বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডল ও তাঁর কন্যা নাকি চারটি লটারি জিতেছেন। আর সেই টাকা ঢুকেছেও ব্যাংকের হিসাবখাতে। কেষ্ট পেয়েছেন ১ কোটি ও ১০ লক্ষ, মেয়ে সুকন্যা পেয়েছেন ২৫ লক্ষ ও ২৬ লক্ষ। আর সেগুলি সব কেনা হয়েছিল একটি বিশেষ অঞ্চলের দোকান থেকে। এদিকে যে যে দোকান থেকে এই লটারির টিকিট কেনার কথা বলা হয়েছে, বাস্তবে কেউই জানে না সেখান থেকে কেষ্ট ও তাঁর মেয়ে কিনেছেন কিনা? তদন্তকারীরা বোলপুরের 'রাহুল লটারি এজেন্সি' নামের লটারির টিকিট বিক্রির একটি দোকানে হানা দিয়েছিল। সেখানে গিয়ে কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। ওই দোকানের মালিক শেখ আইনুলকে লটারির টাকা প্রদান-সহ সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে বোলপুরের ক্যাম্পে কথা বলে সিবিআই। বোলপুরের অন্য এক লটারির টিকিট বিক্রেতা বাপি গঙ্গোপাধ্যায়কে নিজাম প্যালেসে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়।

লটারি ক্ষেত্রে একটা মজা আছে। সেই মজার সুযোগ নিয়েই অনেকে কালো টাকাকে সাদা করেন, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। আর তদন্তকারীদের মতে এভাবেই হয়তো গোরু পাচারের কালো টাকা সাদা হয়েছে। ও হ্যাঁ, লটারির মজার কথাটাই তো বলা হলো না। লটারির টিকিট যার হাতে থাকবে, তিনিই টাকা পাবার অধিকারী। সেই সুযোগে হয়তো দেখা যাবে, প্রকৃত প্রাপকের কাছ থেকে টিকিটটি কিনে নিয়েছেন বিশেষ কেউ। তিনি এই সুযোগে কালো টাকা সাদা করেছেন। খোঁজ চালাচ্ছে সিবিআই। এই বিষয়টাতে ওই লটারি সংস্থার কোনো যোগসাজশ আছে কিনা সেদিকেও নজর দিতে শুরু করেছে ওই গোয়েন্দা সংস্থা। এমনটাই খবর। □

জীবনানন্দ প্রসঙ্গ

আমি বিগত ৪০ বছর যাবৎ স্বস্তিকার পাঠক। চিঠিপত্র কলমে সাধারণত পাঠকের মতামত খুব বেশি পাই না। তবুও সাহস করে আবার পূজাসংখ্যা স্বস্তিকায় সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনানন্দ আবহমান' পাঠ করে বহুদিন আগেকার জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আমার পাঁচ মিনিটের সাক্ষাৎকারের স্মৃতি পাঠকদের অবগতির জন্য এই পত্রের অবতারণা। আমি তখন স্কুল-ফাইনাল পাশ করে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছি। স্বাধীনতার অল্পদিন পরে চট্টগ্রাম থেকে শরণার্থী হয়ে শিবপুরে থাকি। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর আমি প্রচুর টিউশনি করতাম। এই প্রাইভেট টিউশানি করার সুবাদে আমি এক বিধবা মহিলার মেয়েকে পড়াতাম যিনি হাওড়া গার্লস কলেজে লাইব্রেরিতে কাজ করতেন। জীবনানন্দ দাশ তখন হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ওই কবির কবিতা সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। সেই সময় কবির 'বনলতা সেন' নামাঙ্কিত একটি বই আমার হাতে আসে যার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়। ওই প্রচ্ছদই ছিল আমার আসল আকর্ষণ। উৎসাহবশত আমি ওই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি পাঠ করে বিস্মিত হই। এভাবে ছন্দ নিপুণ কবিতা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ না করেও লেখা যায়? অনেক কবিতা দুর্বোধ্য মনে হলেও কিছু কবিতা বেশ ভালো লাগল।

বনলতা সেন কবিতার শেষে 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' পড়ে অবাক হলাম। মনে হলো কবি ভুল করেছেন, ওটা হবে নীড়ের পাখির মতো, কেননা পাখির নীড় কীভাবে চোখ তুলবে? পরে মনে হলো ওর নিশ্চয় কোনো গূঢ় অর্থ আছে। এই প্রসঙ্গে না গিয়ে আসল ঘটনার কথায় আসি। তখন সম্ভবত ১৯৫০-৫১ সাল। আমি ওই মহিলাকে জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে পরিচয় আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, তিনি তো প্রায়ই লাইব্রেরিতে নানা বইয়ের সন্ধানে আসেন। আমি বললাম আমি একবার শুধুই দেখতে চাই। শুধু দেখেই চলে আসব। ওরকম ব্যতিক্রমী কবিকে স্বচক্ষে দেখার আমার খুব আগ্রহ হয়েছিল। তিনি আমাকে একদিন লাইব্রেরিতে আসতে বললেন। যথারীতি এক শনিবার আমি কলেজে ঢুকে লাইব্রেরিতে গেলাম। দেখলাম এক ভদ্রলোক একটা চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছেন। আমাকে দেখে ওই মহিলা বললেন, 'এই যে আপনি যাঁকে দেখতে চান।

আমাকে দেখে অবাক হয়ে উনি বললেন--- 'আপনি আমাকে দেখতে চেয়েছেন?' আমি বললাম 'আমাকে আপনি বলবেন না। আমি এখনও কলেজের ছাত্র।' উনি বললেন, 'ঠিক আছে আমি যে একটি দেখবার বস্তু তাতো জানতাম না।' আমি অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে তিনি বললেন, 'আমাকে কি কিছু বলবার আছে?' আমি মাথা নেড়ে আমার অসম্মতির কথা জানালাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন। ওর আকৃতিতে তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না শুধু চোখদুটি বাদে। তাঁর উজ্জ্বল চোখদুটি যেন কিছু বলতে উন্মুখ। তাঁর কাব্যকৃতি বা কবিতার গূঢ় ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে 'জীবনানন্দ আবহমান' প্রবন্ধে সুব্রতবাবু যা আলোচনা করেছেন তা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কবির সম্বন্ধে এত তথ্য আমি জানতাম না। একটা কথা, প্রবন্ধটির প্রথমে কবির দাশগুপ্তের বদলে দাশ লেখার যে বিষয় জানিয়েছেন সেটা জেনেও দাশগুপ্ত হিসেবে গুপ্ত বিসর্জন না দিয়ে আমি দাশগুপ্ত লেখাই মনস্থ করেছি, কেননা আমি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত নই।

—স্বপন দাশগুপ্ত,
শিবপুর, হাওড়া।

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা

আমি আপনাদের পত্রিকার একজন আগ্রহী পাঠিকা। সেই সূত্রে আমি পত্রিকাগুলির সম্পর্কে কিছু বলবার অধিকার আশা করি অর্জন করেছি। সাম্প্রতিক যে সংখ্যাগুলি আমার হাতে এসেছে সেগুলির সম্বন্ধে বলার জন্যই এই চিঠি।

স্বীকার করতেই হচ্ছে, অনেকদিন পর এমন একটি পত্রিকার পুজো সংখ্যা পেয়েছি যা পুরোটাই পড়তে পারা গেছে। এই সংখ্যাতে প্রত্যেকটি লেখাই সুন্দর ও উল্লেখনীয়। হালকা ভাবে লেখা হলেও বেশ বিশ্লেষণ যুক্ত গোপাল ভাঁড়ের ওপর প্রতিবেদনটি একটি নতুন চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সাম্প্রতিক সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বড়ো গল্পগুলি সুপাঠ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় সুসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে, কিন্তু গল্পের আঙ্গিক সম্পূর্ণ বজায় রয়েছে। স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ ও শ্রী রঙ্গাহরির গুরুগম্ভীর বিষয় সম্পর্কে বলবার যোগ্যতা আমার নেই। কেবল বলতে পারি ওগুলি বার বার পড়া এবং অনুধাবন করার যোগ্য। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধগুলিও বিচিত্র, সুন্দর ও সুসংহত। সবিশেষ উল্লেখনীয় 'বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে' উপন্যাস। এটি পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কল্পনা এবং সামগ্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সংমিশ্রণে একটি অনন্যসাধারণ প্রতিবেদন এরকম একটি অসাধারণ সংখ্যার জন্য স্বস্তিকার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই। বিশেষ করে সম্পাদক-মণ্ডলীর সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

—শ্রীমতী দ্যুতি ঘোষ,
চেতলা, কলকাতা-২৭।

মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে

গত ২৪ অক্টোবর সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে বরুণ মণ্ডলের প্রতিবেদনের সব তথ্য সমর্থনযোগ্য নয়। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়ার সঙ্গে পুজোতে অনুদান দেওয়ার প্রসঙ্গ একটা ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া কিছু নয়। এ নিয়ে কোনো বিতর্ক হয়নি। আর রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়া একটা অধিকারের মধ্যেই পড়ে। হাইকোর্টের রায় থেকেও এটা প্রমাণিত। তাছাড়া সর্বভারতীয় মূল্যবৃদ্ধির সূচকের ভিত্তিতে ডিএ পাওয়া রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একটা অধিকার। আর এই ন্যায্য অধিকার থেকে যখন কর্মচারীরা বঞ্চিত হয়

তখন তো মামলা, আন্দোলন হবে এটাই তো স্বাভাবিক। বস্তুত মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে যে ভাতা দেওয়া হয় তাই মহার্ঘভাতা বা ডিএ বলে পরিচিত। আর এই মহার্ঘভাতার সূচনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই। বস্তুত স্বাধীনতার আগের বছর থেকে প্রতি বছর মূলত দুবার করে এই বর্ধিত ভাতা দেওয়া হতো জানুয়ারি ও জুলাই মাসে। ফলে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সরকারি, আধা সরকারি বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের বাজার দরের সঙ্গে আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য বজায় থাকত। দীর্ঘ বাম জমানাতেও এই ধারা বজায় ছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর বর্তমান রাজ্য সরকারের আসলে সরকারি কর্মচারীরা মহার্ঘভাতার আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। এছাড়াও বাড়িভাড়া ১৫ শতাংশ থেকে কমে ১২ শতাংশ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের হয়তো এসব তথ্য বেশি জানা নেই। আবার মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে দিনমজুর, ব্যবসায়ী বা অন্য পেশার মানুষের কিন্তু আয় বৃদ্ধি হয়ে থাকে। সেখানে শুধুমাত্র সরকারি বা আধা সরকারি কর্মচারীদের মাস মাহিনা থমকে দাঁড়িয়ে আছে মহার্ঘভাতা বন্ধ হবার কারণে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বৈষম্য চিরকালই আছে বা থাকবে।

অথচ অন্য অনেক রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের স্বাভাবিক হারেই মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়। তাছাড়া রাজ্যের দুর্গাপুজোর অনুদান কি সত্যিই প্রয়োজন আছে? এর আগে অনুদান ছাড়া কি পুজো উদ্যোক্তাদের আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়তে হতো? অনুদান দেওয়ার আগেও তো পুজোর সময় সব ধরণের মানুষ আর্থিকভাবে উপকৃত হতো একথা অনস্বীকার্য। আর রাজ্য সরকারের যদি আর্থিক অনটনের জন্য মহার্ঘভাতা দেওয়া বন্ধ থাকে তবে রাজ্যে লক্ষ্মীভাণ্ডার থেকে শুরু করে সব স্তরের মানুষদের দান খয়রাতি করার ক্ষেত্রে তো আর্থিক অনটনের প্রশ্ন আসে না। তাহলে আর্থিক অনটন একটা অজুহাত মাত্র বলা যেতে পারে। তবে অবশ্যই রাজ্য সরকারের অন্য জনমুখী প্রকল্পকে প্রশংসা করতে হয়। তবে সমাজের সব স্তরের মানুষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার বিষয়টিও ভেবে দেখা দরকার বলে মনে হয়। তাহলে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক সামঞ্জস্য বজায় থাকবে বলে মনে হয়।

—**সমীর কুমার দাস,**
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

হিজাব প্রসঙ্গ

ভারত ও ইরান— এশিয়া মহাদেশের দুই দেশ। হিজাব নিয়ে দুই দেশের দুই অবস্থান। ইরান ইসলামি দেশ আর ভারত হিন্দু অধ্যুষিত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ইরানে মোল্লাবাদীরা মহিলাদের ওপর জোর করে হিজাব চাপিয়ে দেওয়ার ফতোয়া দেওয়ার জেহাদ ঘোষণা করেছে ইরানের মহিলারা। আর ভারতেও জোর করে হিজাব চাপিয়ে দেওয়া অন্য ধরনের এক ফতোয়া। ভারতে হিজাব পরতে মহিলাদের কোথাও বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়নি। কেবলমাত্র মহিলারা বিদ্যালয়, কলেজে হিজাব পড়ে আসতে পারবেন না। কারণ আমাদের দেশে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে বিদ্যালয়, কলেজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত পোশাক পরেই তাদের বিদ্যালয়ে আসতে হয়। এই নিয়ম সব ধর্মের ছেলে-মেয়েদের জন্য জরুরি। এ নিয়ম বহু বছর ধরে চলে আসছে। হঠাৎ মোল্লাবাদীরা কর্ণাটকে ফরমান জারি করল বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পোশাক নয়, হিজাব পড়েই তারা স্কুল-কলেজে যাবে। বিতর্ক গড়ায় শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। গত ১৩ অক্টোবর আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ একমত হতে পারেনি। ফলত, কর্ণাটকের উচ্চ আদালতের রায় বহাল থাকছে। অর্থাৎ হিজাব নয়, বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করে মেয়েদের বিদ্যালয়ে যেতে হবে। আগামীদিনে এই মামলা বৃহত্তর ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার সম্ভাবনা। এদেশে হিজাব মামলার অবস্থান যাইহোক এই মহাদেশের আরেক দেশ ইরানের মহিলারা মোল্লাবাদীদের এই ফরমানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। সারা বিশ্বে মহিলারা জনসংখ্যার অর্ধেক। দুনিয়ার মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে সমানতলে এগিয়ে চলেছে। সেখানে তারা বেরাখার আড়ালে, হিজাব পরে, পর্দার অন্তরালে আর থাকতে চাইছে না। সেখানে পরিস্থিতি এতটাই অগ্নিগর্ভ যে, প্রগতিবাদী পুরুষরাও শামিল মহিলাদের এই আন্দোলনের সমর্থনে। গৃহযুদ্ধের মতো অবস্থা সেখানে। এটা একরকম নারী বিদ্বেষী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দমননীতি যা এতদিন সহ্য করে এলেও এখন ধৈর্যের বাধ ভেঙে গেছে। এই ঘটনা এক মহিলা মৃত্যুবরণ করেছে। ইরানের নীতি পুলিশ তার পরিহিত পোশাকের জন্য গ্রেপ্তার করে এবং অত্যাচার চালায়। এই ঘটনার জেরে ইরান উত্তাল। এরপরে মহিলাদের ওপর নির্যাতন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। শুধু ইরানের মহিলা নয়, সেদেশে অন্য দেশের মহিলা, অন্য ধর্মের মহিলাদের ওপর এই ফতোয়া জারি করেছে মোল্লাবাদীরা।

গত চার দশক ধরে সরকার আরোপিত নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করে আসছে মহিলারা। তারা সমানাধিকার চান। আজ যা আমরা দেখছি তা নিষ্পেষিত নারীদের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে, পারিবারিক আইনের দ্বিচারিতা, বিচ্ছেদ মামলা-সহ শিশুদের অধিকার নিয়ে যে সব বৈষম্য তার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ। এমনকী হিজাব পরিহিতা মহিলাদের দাবি যে, যারা হিজাব পরতে না চায় তাদের ওপর যেন খড়্গহস্ত না হয় প্রশাসন। এদিকে ১৩ অক্টোবর দেশের শীর্ষ আদালতের এক বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন, প্রি ইউনিভার্সিটির পড়ুয়াদের স্কুল গেটে হিজাব খুলে ফেলা তাদের স্বাধীনতা ও মর্যাদার ওপরে আক্রমণের শামিল। কিন্তু কর্ণাটকের এই হিজাব বিতর্ক মোল্লাবাদীদের সৃষ্ট। এখানে বিচারপতির ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রতিটি বিদ্যালয়ের নিজস্ব ইউনিফর্ম আছে এবং প্রতিটি পড়ুয়া সেই ইউনিফর্ম পরেই বিদ্যালয়ে আসবে এটাই নিয়ম। এটা কারুর মর্যাদা হানিকর বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ডিভিশন বেঞ্চ গেছে এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

—**তারক সাহা,**
হিন্দমোটর, হুগলী।

গ্রামাঞ্চলে নারীশক্তি বিকাশে সরকারি উদ্যোগ

দীপ্তি সেনগুপ্ত

মাস আটেক আগে নরেন্দ্র মোদী যে প্রতিশ্রুতি দেন, আজ তা প্রায় বাস্তবায়িত হতে চলেছে দেশের তাবৎ গ্রামীণ আর্থিক উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ যুগপৎ অনাবিল ও সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠায়। মোদীজী জানিয়েছিলেন, 'দীয়দয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা' গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে আর্থিক উদ্যমের জোয়ার এনেছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে (ডিসেম্বর ২১, ২০২১)। যে গতিতে কাজ চলেছে, ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে ভারতের গ্রামীণ এলাকার প্রায় ১০ কোটি পরিবারে লক্ষণীয় আর্থিক উন্নয়ন ঘটাবে ওই যোজনা। মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার যে সব পদক্ষেপ চলতি আর্থিক বছরে নিয়েছে, তাদের মধ্যে দুটি বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(ক) মহিলাদের দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

(খ) মহিলাদের মধ্যে উদ্যামস্পৃহা বাড়াতে সরকার জারি করেছেন মুদ্রা যোজনা।

এই দুই প্রয়াসকে সাফল্যের শীর্ষে তুলে আনতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির এক সমন্বয় গড়ে তোলা হচ্ছে, যাকে বলা হচ্ছে DAY--NRLM, যার অধীনে রয়েছে বেশ কয়েকটি মন্ত্রকসমূহের কর্মধারাও :

(১) কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক,

(২) গ্রামোন্নয়ন দপ্তর,

(৩) পশুপালন, ডেয়ারি ও মৎস্যচাষ দপ্তর,

(৪) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক,

(৫) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রক,

(৬) ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক,

(৭) সামাজিক ন্যায় ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক।

এই সাতটি দপ্তরই খুব জোর দেবে মহিলাদের ক্ষমতায়নের ওপর। ব্যাংকগুলিকে বলা হয়েছে, মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণপ্রদানে উদার হতে। তাদের ক্ষেত্রে সুদের হারও হবে কম। জীবিকা নির্বাহে মহিলাদের অংশগ্রহণকে বড়ো করে তুলতে সরকার নিজেকে দায়বদ্ধ বলে ব্যাখ্যা করেছে। বিশেষ জোর দিয়েছে কৃষিকর্মে মহিলাদের অংশ গ্রহণের ওপর। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ২০২১-২২ আর্থিক বছরে দেশের ব্যাংকগুলি ৮২ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। লক্ষণীয়, মহিলাদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলির ঋণ পরিশোধের হার অন্যান্য ঋণের চেয়ে বেশি।

দেশে ই-বিপণনের প্রসার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই মহিলাদের স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলিও যাতে ই-বিপণনে প্রশিক্ষণ দেবার কথা ভাবছে। বিহার, অসম, কেরল, সিকিম, মধ্যপ্রদেশ— এই পাঁচটি রাজ্যের সরকার এই বিষয়ে অন্য রাজ্যদের তুলনায় এগিয়ে আছে।

সুস্থ-সবল কোলনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সুপারফুড

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

খাবার ঠিকঠাক হজম হলে শরীর অনেকটাই সুস্থ থাকে। আর সেজন্য কোলনের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখাটাও জরুরি। কোলোনকে আমরা বৃহদন্ত্র বলি। প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষের কোলোন প্রায় চার থেকে ছয় ফুট লম্বা হয়। আমাদের পরিপাকনালীর শেষাংশে থাকে কোলন, এটি যা খাওয়া হয় শরীরে তার থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলি নিয়ে বাকিটা মল হিসেবে বের করতে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ার আগে শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদান যেমন নির্দিষ্ট কিছু ভিটামিন, লবণ, পুষ্টিকর পদার্থ ও জল কোলন শুষে নেয়। কোলোন শরীরের মধ্যে প্রবহমান তরল পদার্থের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য ও অন্যান্য নানা কারণে কোলনে বিবিধ রোগ হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে কমন হলো কোলোরেক্টাল ক্যানসার, কোলনে পলিপ হওয়া, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম, ক্রনস ডিজিজ, সিলিয়াক ডিজিজ ইত্যাদি। তবে এই সকল রোগব্যাধিকে দূরে সরিয়ে রেখে কোলনের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে খাবারের একটা উপকারী ভূমিকা রয়েছে। কী কী খাবার তার তালিকা দেওয়া হলো :

(১) **ফল :** কোলনের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ফাইবারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অনেক ফলই ফাইবারসমৃদ্ধ, তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উপকারী ভূমিকা নেয় র‍্যাস্পবেরি মোটামুটি কাছাকাছি ফলাফল পাওয়া যায় আপেল, ব্লুবেরি, কমলালেবু থেকেও। এগুলি সবই ফাইবারের দুর্দান্ত উৎস। প্রতি এককাপ এইসব কুচোনো ফল থেকে ৮ গ্রাম ফাইবার পাওয়া যায়। ফলের স্যালাড বানিয়ে কিংবা কাঁচা খেয়ে অথবা এই ফলের ফ্লেডারের জ্যামও খেতে পারেন মাঝে মধ্যে (তবে খুব বেশি নয়) স্বাদ বদলাবার জন্য। তবে গোটা ফল খেলে বা কেটে খেলেই শরীরে সবচেয়ে বেশি ফাইবার যায়।

(২) **শস্যজাতীয় খাবার :** সকালের ব্রেকফাস্টে ওটস বা স্যুপে, রাতের বা বিকেলের স্টুতে ডাল বা দানাশস্য দিয়ে দিন

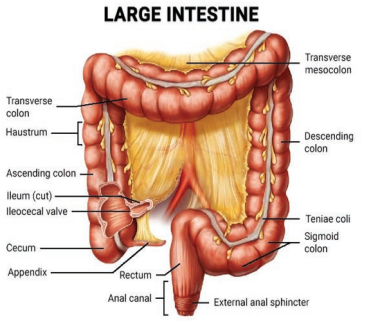

কয়েকটা, ফাইবারে সমৃদ্ধ এগুলি দ্রুত হজমে সাহায্য করে। তবে প্লেন ওটস খাবেন, এটা বেশি উপকারী, ফ্লেভারড নয়।

(৩) **বিনস :** বিনসেও প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বর্তমান। সেদ্ধ করে কিংবা তরকারি করে খেতে পারেন এই সবজিটি।

(৪) **দই :** ডেয়ারি প্রোডাক্টে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি। মানবশরীরে কোলোরেকটাল ক্যানসার দূর করার অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান ভিটামিন ডি। দই, বিশেষ করে টকদইতে প্রচুর পরিমাণে ভালো ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা অন্ত্রে ভালো ও খারাপ ব্যাকটেরিয়ার সমতা রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল হেলথ ভালো থাকে। এছাড়া দইয়ের ক্যালসিয়াম কোলনের অন্যান্য রোগের সম্ভাবনাকে অনেকাংশে প্রতিহত করে। কাজেই প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার পরে একবাটি টকদই খান। তবে এতটাও বেশি খাবেন না যাতে পেট খুব ভার হয়।

(৫) **ব্রাউন রাইস :** এখন অনেক চিকিৎসক পুষ্টিবিদই সাদাভাতের বদলে ব্রাউনরাইস খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। এতে সাদাভাতের তুলনায় যেমন পুষ্টি উপাদান বেশি, তেমনি এটি কোলনকে সবদিক থেকেই রাখে সুরক্ষিত। আর এতে থাকা ফাইবার ভীষণভাবেই হজমের জন্য জরুরি। তাই আজ থেকেই অভ্যাস গড়ে তুলুন ব্রাউনরাইস খাওয়ার।

(৬) **গাঢ় রঙের সবজি :** ফলের মতো গাঢ় রঙের অনেক সবজিই উচ্চ ফাইবারযুক্ত, যা হজম সংক্রান্ত অঙ্গগুলির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার সহায়ক। সেজন্যই সবজির মধ্যে ব্রকোলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, পালংশাককে রাখুন সবার উপরে। এগুলিতে থাকে অনেকটা করে ডায়েটারি ফাইবার। সঙ্গে কুমড়োর বীজ, তিসির বীজ, কলমিশাক, ঢ্যাঁড়শ, পটোল খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা কমবে।

(৭) **সামুদ্রিক মাছ :** আপনার কি কোলনের সমস্যা, সেজন্য পছন্দের সামুদ্রিক খাবারকে বাদ দিতে হচ্ছে? তাহলে চিন্তা নেই, আর বাদ দিতে হবে না। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত সামুদ্রিক মাছ যেমন স্যামন, ম্যাকারেল, টুনা ইত্যাদি ডায়েটে রাখুন। এই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড কোলনের যে কোনও ধরনের প্রদাহ কমায়, পাশাপাশি কোলনের কোষগুলির কার্যকারিতাকেও উন্নত করে।

(৮) **জিরা :** জিরা শুধু খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, জিরা নানান ওষুধেও ব্যবহৃত হয়। জিরাতে আছে কামিনএলডিহাইড নামের একটি উপাদান যা কোলনের ভেতরের ক্ষতকে প্রতিরোধ করে।

(৯) **কলা :** কলাতে আছে প্রচুর পটাশিয়াম যা বিপাকীয় প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত কলা খেলে কোলোন বা মলাশয়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। কলা শুধু কোলোনকেই নয়, পাকস্থলীকেও ভালো রাখে।

(১০) **চীনাবাদাম :** চীনাবাদাম নিয়মিত খেলে কোলোন ঠিক থাকে। কোলোনে ক্ষত হতে পারে না। কারণ বাদামে আছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ম্যাগনেশিয়াম উপাদান।

সবশেষে বলব, ফল, সবজি, হোল গ্রেনস, সামুদ্রিক মাছ দিয়ে একটি ব্যালেন্স ডায়েট তালিকা প্রস্তুত করুন, যা কোলনকে সবদিক থেকে ভালো রাখবে। পাশাপাশি রেডমিট, প্রোসেসড মিট এড়িয়ে চলুন। এগুলি থেকে কোলনের প্রচুর ক্ষতি হয়। সঙ্গে নিয়মিত এক্সারসাইজ ও প্রচুর জলপান করলে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে। □

গ্যাম্বলিং আর গেমের তফাত গুলিয়ে দিচ্ছে অনলাইন অ্যাপ

দীপ্তাস্য যস

ছোটোবেলায় অভ্যেস ছিল কাগজের প্রথম পাতা একবার দেখেই শেষপাতায় চলে যাওয়া, কারণ খেলার খবর সেখানেই পাওয়া যায়। আরও অভ্যেস ছিল কাগজ এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে নিজের প্রিয় খেলোয়াড়দের ছবি কেটে নোটবুকে জমানোর। সযত্নে রাখা সেসব খাতা এখনও শৈশবের স্মৃতি উসকে দেয়। সে খাতায় কে ছিল না, শচীন, সৌরভ, কুম্বলে থেকে শুরু করে স্টেফি গ্রাফ, আন্দ্রে আগাসি, রোনাল্ডো, মারাদোনা সবাই হাজির নোটবুকের দুই মলাটের ভেতরে। স্কুলে বা পাড়ায় কোনো কোনো বন্ধুর নোটবুক তাদের ছবির কালেকশানের জন্য আমাদের কাছে রীতিমতো ঈর্ষার বিষয় ছিল। মোবাইলহীন সেই যুগে এসবই ছিল আমাদের 'সম্পত্তি'।

এখন যুগ পালটেছে। ক্রিকেট এখন রোজই খেলা হচ্ছে। খেলার খবরও এখন আর শেষপাতায় নয়, প্রথম পাতাতেই ছাপা হয়। সবক্ষেত্রেই প্রচলিত নিয়ম পালটাচ্ছে, সংবাদপত্রও আর তার বাইরে নয়। সংবাদপত্রেরও এখন প্রথম পাতা আর শেষ পাতার ফারাক নেই। বহু ক্ষেত্রেই শেষপাতার খবরই প্রথম পাতায় উঠে আসে, আবার প্রথম পাতার খবর বহু ক্ষেত্রেই মাঝের পাতায় চলে যায়। প্রচলিত নিয়ম ভাঙতে ভাঙতে এখন এমন সময় উপস্থিত হয়েছে যখন প্রথম পাতা আর সংবাদ শিরোনামের নয়, বিজ্ঞাপনের দখলে চলে গেছে। একসময় যে খেলোয়াড়দের ছবি পেতে আমাদের রীতিমতো পত্রপত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করতে হতো, সেই খেলোয়াড়, অভিনেতারা এখন প্রায় প্রতিদিনই এইসব বিজ্ঞাপনের মুখ হয়ে সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় উপস্থিত হন। খেলোয়াড়, অভিনেতা এদের আবেদন সর্বজনব্যাপী, তাই খুব স্বাভাবিক প্রায় প্রতিটি বাণিজ্যিক সংস্থাই নিজেদের পণ্যের প্রচারের জন্য এই তারকাদের ইমেজকে ব্যবহার করতে চাইবেন। এই তারকারা নিজেদের অর্জিত খ্যাতির মাধ্যমে মানুষের মনে যে কোনো দ্রব্য সম্বন্ধে খারাপ বা ভালো ধারণা প্রস্তুত করতে সাহায্য করেন। আদিকাল থেকেই যে কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের বিজ্ঞাপনে মুখের গুরুত্ব অপরিসীম। কিছু কিছু বিজ্ঞাপন তো মানুষের মনে চিরতরে দাগ কেটে যায় পণ্য এবং তাদের বিজ্ঞাপনের মুখের জন্য। যেমন শচীন তেন্ডুলকর ও কপিল দেবের বিজ্ঞাপন আজও সেই প্রজন্মের মনে গেঁথে আছে। এই প্রবণতা খুবই স্বাভাবিক। কারণ এই খেলোয়াড় বা অভিনেতারা নিজেদের কাজের মাধ্যমে সেই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন বা বলা ভালো জনমানসে বিপুল পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন নিজেদের পারফরম্যান্সের মাধ্যমে। জনতা এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়,

তাই বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এদের নিজেদের পণ্যের প্রচারের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেন। বাণিজ্যিক দুনিয়ায় এ একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এর সঙ্গেই আসে এক অমোঘ প্রশ্ন, তারকাদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার। সাধারণত সমাজ যাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তারা সমাজের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ, সেই প্রশ্নও সময়ে অসময়ে উঠবে।

এই সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নেই বেশ কিছু ক্ষেত্রে তারকাদের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। যেমন তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে বারেবারেই এই প্রশ্ন উঠেছে, তেমনই এখন বিভিন্ন সময়ে সৌরভ গাঙ্গুলি বা পশ্চিমবঙ্গের ব্র্যান্ড অ্যাম্ব্যাসাডার শাহরুখ খানের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনলাইন গেমিং অ্যাপের বিজ্ঞাপনে মুখ হিসেবে দেখা গেছে। বিশেষত এমন কিছু গেমিং অ্যাপ যেগুলির উদ্দেশ্য নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে। যেমন বেশ কিছু ক্রিকেটারকে দেখা যায় একটি অনলাইন গেমিং অ্যাপের বিজ্ঞাপনে। এই অ্যাপটিতে বলা হয় যে কোনো ম্যাচের আগে যে কেউ তার নিজস্ব পছন্দের একাদশ বানাতে পারে এবং সেই একাদশের বাস্তবের একাদশের সঙ্গে যত বেশি মিল থাকবে অংশগ্রহণকারীদের তত বেশি সুযোগ থাকে পুরস্কার মূল্য জিতে নেওয়ার। আর এখানেই প্রশ্ন ওঠে এই অ্যাপগুলির উদ্দেশ্য নিয়ে।

ক্রিকেটের প্রথম একাদশ নির্বাচন একেবারেই একটি বিশেষজ্ঞের বিষয়। সাধারণ মানুষ তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করতে পারে কিন্তু অভ্রান্ত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকী ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাও নিজ নিজ মতামতটুকু জানাতে পারেন শুধু, তাদের পক্ষেও অভ্রান্ত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ এটি একেবারেই টিম ম্যানেজমেন্টের বিষয়। প্রশ্ন ওঠে ঠিক এখানেই।

এই অ্যাপগুলির কোনোটিই প্রায় বিনামূল্যে নয়, এখানে প্রায়ই পুরস্কার জেতার জন্য, প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রাথমিক কিছু এন্ট্রি ফি অংশগ্রহণকারীকে দিতে হয় খুব কম পরিমাণে হলেও। এখানেই প্রশ্ন ওঠে ঠিক কতজন অংশ নিচ্ছেন এবং ঠিক কতজন পুরস্কার পাচ্ছেন? কারণ এর

কোনো তথ্যই সাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয় না। প্রত্যেকে শুধু তার ব্যক্তিগত ফলাফলই জানতে পারেন। আরও প্রশ্ন ওঠে এই যে টিম অনুমান করা, কে জিতবে, কে কত রান করবে বা কে কয় উইকেট নেবে এই অনুমানের ভিত্তিতে রোজগারের প্রলোভন এটিই কি জুয়ার আদি রূপ নয়? ক্রিকেট জুয়ার সেই আদি রূপই কি অনলাইন গেমিং অ্যাপের রূপ ধরে হাজির হয়নি?

এই ক্ষেত্রেই প্রশ্ন ওঠে সৌরভ গাঙ্গুলি বা শাহরুখ খানদের সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে। তাঁদের মতো অভিজ্ঞ লোকেরা নিশ্চয়ই জানেন এগুলিতে মানুষ যত না জিতবে তার থেকে বেশিবার হারবে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনা আছে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ম্যাচে টিম কী হতে পারে বা কোন ম্যাচে কোন ক্রিকেটার ভালো খেলতে পারেন সে নিয়ে তারা অনুমান করতে পারেন কিন্তু একশোবারের মধ্যে নিরানব্বই বারই সেই সম্ভাবনা মিলবে না, কারণ তাঁরা কেউই বিশেষজ্ঞ নন। কাজেই যে তারকারা এই সাধারণ মানুষদের প্রভাবিত করছেন বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে বলা উচিত উৎসাহিত করছেন এগুলিতে অংশ নেওয়ার জন্য তারা কি আসলে জুয়াতেই উৎসাহ জোগাচ্ছেন না?

এই গেমিং অ্যাপগুলি অবশ্যই জুয়ার আরেকটি রূপ এবং এগুলির উদ্দেশ্য যে সৎ নয় তাও বিভিন্ন ঘটনায় আমরা দেখেছি। যেমন বর্তমানের অতি চর্চিত ঘটনা গার্ডেনরিচের আমির খান নামক ব্যক্তির অনলাইন গেমিং অ্যাপের নামে প্রতারণার ঘটনা। ইডি ইতিমধ্যেই দুই দফায় এই ব্যক্তির

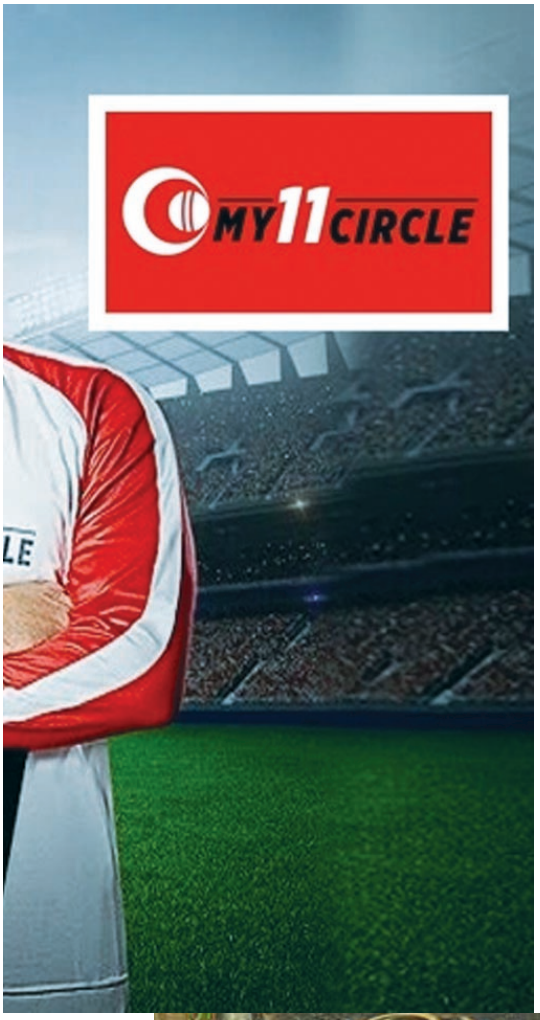

থেকে পর্যায়ক্রমে সতেরো কোটি এবং আটষট্টি কোটি টাকার ক্রিপ্টোকারেন্সি উদ্ধার করেছে। এই গেমিং অ্যাপটিরও মূল চরিত্রও একই ছিল। অংশগ্রহণকারীরা স্বল্প পরিমাণ টাকার বিনিময়ে গেমে অংশ নিতেন। প্রথম প্রথম তারা কিছু অর্থ জিততেন, তারপরে সেই অর্থ এবং কখনও কখনও আরও অর্থ বিনিয়োগ করতেন আরও লাভের আশায়। এইভাবে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ হওয়ার পরেই আমির খান সেই অর্থ তছরূপ করেন এবং অংশগ্রহণকারীরা সমস্ত বিনিয়োগই খোয়ান। এই টাকা যে কী বিপুল পরিমাণ তা ইডির উদ্ধারকৃত অর্থের পরিমাণ দেখেই সহজেই আন্দাজ করা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রেও এজাতীয় আরও নানা প্রতারণার ঘটনা উঠে এসেছে। কিন্তু এরপরেও সংবাদপত্রগুলি এজাতীয় গেমিং অ্যাপের বিজ্ঞাপন ছাপানো বন্ধ করেনি এবং তারকারাও সেই বিজ্ঞাপনের মুখ হওয়া বন্ধ করেননি। এখানেই প্রশ্ন ওঠে তারকাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে।

সৌরভ গাঙ্গুলি বা মমতা ব্যানার্জি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার শাহরুখ খানের পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে আবেদন অবশ্যই বিপুল। সেই কারণেই বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তাদের বিপুল চাহিদা। প্রত্যেক মানুষেরই অধিকার আছে নিজ নিজ পরিশ্রম এবং মেধার বিনিময়ে সৎ পথে অর্থ রোজগারের। এই তারকারা নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমেই জনমানসে এই বিপুল আবেদন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কাজেই বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনের মুখ হওয়ার বিনিময়ে তাদের অর্থ রোজগারে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না, নেইও। কিন্তু আইনের ফাঁক গলে যখন অনলাইন গেমের নামে জুয়া চলে এবং তারা সেই জুয়াতে সাধারণ মানুষকে অংশ নিতে উৎসাহিত করেন তখন অতি অবশ্যই তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে এবং সেক্ষেত্রে তাদের কাছে জবাবদিহির দাবিও থাকবে। এরা সচেতন মানুষ, বহু ক্ষেত্রেই সমাজ এদের অভিভাবকরূপে দেখে, সেই জায়গা থেকে যে কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এদের আরও দায়িত্বশীল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জনগণের এটাই সামান্য প্রত্যাশা এই তারকাদের কাছে। সবাই তো আর অনুব্রত মণ্ডলের মতো ভাগ্যবান নন, যে তাদের কাছে বারেবারে লটারি জেতার মতো নিশ্চয়তা আছে। কাজেই তারকাদের বিজ্ঞাপনের আগে সেই বিজ্ঞাপন সাধারণ মানুষের কোনো আর্থিক বা শারীরিক ক্ষতির কারণ হচ্ছে কিনা সে দিকটিও অবশ্যই ভাবতে হবে। ■

একাকিত্বের দরজায় কড়া নাড়ছে অনলাইন জুয়ার দুনিয়া

নিখিল চিত্রকর

হাতের মুঠোয় একটা মোবাইল ফোন। তার হাজারো ফিচার্স, অগুনতি অ্যাপ্লিকেশনস। আজকের মুঠোফোন নির্ভর মনুষ্যসমাজ সেইসব অত্যাধুনিক মেটাভার্সের সমুদ্রে অন্তর্জাল বিছিয়ে প্রতিনিয়ত ডাউনলোড করছে একটার পর একটা অ্যাপ। সেই অ্যাপে বাড়িতে বসেই নানা বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন নেটিজেনরা। সেই নিরিখে এই সমাজ দুই দলে ভাগ হয়েছে এখন। একদল একটু সেকেলে ধরনের। তাঁরা নিয়ম করে একসঙ্গে একজায়গায় জড়ো হয়ে আড্ডা দিতে ভালোবাসেন। সকালে খবর পড়েন ছাপা খবরের কাগজে। সিনেমা দেখেন সিনেমা হলে গিয়ে। বইপাড়ায় গিয়ে বই কেনেন। মেটাভার্সের দুনিয়ায় এরা অফলাইন নাগরিক। অন্যদল সকালে ঘুম থেকে উঠে খবর দেখেন মোবাইলের নিউজ অ্যাপে। লোক-লৌকিকতা সারেন ভিডিয়ো কলে। নিয়ম করে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেন গ্রুপ চ্যাট-এ। এবং সবজি থেকে শুরু করে জামাকাপড় অবধি যাবতীয় কেনাকাটা করেন মোবাইলের শপিং অ্যাপের মাধ্যমে। এরা অনলাইন নাগরিক।

বলাবাহুল্য অনলাইন দুনিয়া মানুষের শারীরিক অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ করছে সন্তর্পণে। বন্ধুত্ব পাতানোর জন্য এখন আর উজিয়ে গিয়ে যোগাযোগ করার দরকার পড়ে না। ইন্টারনেটের সমাজমাধ্যমেই অপেক্ষা করে আছে দেশ-বিদেশ-বিভুঁইয়ের অযুত-নিযুত বন্ধু। একটা 'রিকোয়েস্ট' পাঠালেই কেল্লা ফতে। বিদেশি ভাষা না জানলেও হবে। অটোমেটেড ট্রান্সলেশন অ্যাপ্লিকেশনের দৌলতে চীনে, সোমালী, বসনিয়ান, আর্মেনিয়ান সব ধরনের ভাষার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কী করবেন? তারও উপায় তৈরি। লুডোর মতো নানাধরনের গেম-এর ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে। বাড়িতে যাদের গৃহস্থালির কাজের পর সময় কাটত না তারা এখন ফেসবুক-ইন্সটাগ্রাম-শেয়ার চ্যাটের মতো অ্যাপে বিদেশ-বিভুঁইয়ের বন্ধুদের সঙ্গে লুডো খেলে অবসর যাপন করছে। বলাবাহুল্য অনলাইনে মানুষের আলাপনের বিচরণ অনেকটাই বিস্তৃত। এখানে মানুষ অনেক বেশি নিজেকে এক্সপোজ করতে ব্যস্ত। কে একটা জামা কিনল, কে বেগুন ভর্তা বানালো, কারও সামান্য আঙুল কেটেছে, কারও বন্ধু বিচ্ছেদ হয়েছে, কেউ কেউ বাহারি চুলের নতুন কেতা দেখাতে ছবি পোস্ট করছে। সবার সব আবেগ প্রকাশ করার গন্তব্য হলো ইন্টারনেট সমাজ মাধ্যম। ইচ্ছে হলে বেডরুমের ছবিটাও শেয়ার করে দেয় এমন পরিস্থিতি। হালফিলের মানুষের এই দেখনদারিকেই হাতিয়ার করছে অনলাইন বিজনেস ইনভেসটাররা।

একান্নবর্তী পরিবারের কনসেপ্ট উঠে যাওয়ায় এখনকার মানুষ বিশেষ করে মহিলারা একা। বিলাসী একাকিত্বে বড়ো বেশি কাতর তারা। এদের কাছেই সঙ্গ বিক্রি করছে অনলাইন কারবারিরা। করোনা ভাইরাসের হানায় জেরবার মনুষ্যসমাজ যখন দূরত্ব বাড়াতে তৎপর তখন অনলাইন দুনিয়ার চোরাশিকারিরা মানুষের একাকিত্ব দূর করতে নানা ফন্দিফিকির নিয়ে হাজির হলো অণু পরিবারগুলোর ড্রইংরুম থেকে কিচেনে। সেখানে সব উপকরণই সাজানো আছে পরতে পরতে। খেলা, খেলার সঙ্গী, পরিচয়, বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা, ডিজিটাল যৌনতা এবং সবশেষে সাইবার ক্রাইমের জালে জড়ানো। অবশ্য সবটাই নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের ওপর। তিনি এই পথে কতটা পা বাড়াবেন। একসময় 'ব্লু হোয়েল', 'মোমো'র মতো অনলাইন সুইসাইডাল গেম বাবা-মায়েদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। সেখানে খেলার একেবারে শেষধাপে নানা ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে ব্ল্যাকমেলিঙের জালে জড়িয়ে ফেলা হতো খেলোওয়াড়কে। তাকে আত্মহত্যা করতে হতো । এটাই ছিল নিয়ম।

অনেকেই বলবেন, এ হলো মস্তিষ্কের বিকৃতি। তা ১০০ শতাংশ ঠিক। কিন্তু কী অবলীলায় কিশোর-কিশোরীরা দলে দলে আত্মহত্যা

করেছিল সেইসময়। বড়ো বড়ো সাইকিয়াট্রিস্ট তার কুলকিনারা করতে পারেননি। মুঠোফোনে সবুজ আলো জ্বলতে থাকা পুরো অনলাইন দুনিয়াটাই একটা ভ্রম। যেখানে সবকিছুই মিউচুয়াল আর ভার্চুয়াল। ২০১৭ সালে মে মাসের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের গোড়া থেকেই বাজারে একধরনের ভার্চুয়াল ক্রিকেট গেমিং অ্যাপ এলো। সেখানে নিজের পছন্দের টিম বানাতে হতো ম্যাচের কয়েক ঘণ্টা আগে। ওই টিমের মধ্যে নাম থাকা কোনও প্লেয়ার যদি মাঠে নেমে বাস্তবে বড়ো রান করত অথবা উইকেট পেত, তবে অনলাইন গেমারদের পয়েন্ট বাড়তো। শুরুর দিকে গেম খেলতে কোনও টাকা লাগত না বা জিতলে কোনো প্রাইজ মানিও ছিল না। শুধুমাত্র প্লে-স্টোর থেকে অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিলেই হতো। পরের দিকে শুরু হলো টাকার খেলা। অনলাইন গ্যাম্বলিং। যা থেকে জুয়ার নেশায় বুঁদ হতে থাকল অনলাইন খেলোয়াড়রা। এখন ডজন খানেক এই ধরনের অ্যাপ ঘোরাফেরা করছে বাজারে। শুধু ক্রিকেট নয় রামি, লুডো,ব্যাডমিন্টন, ফ্যান্টাসি স্পোর্টস, শেয়ার ট্রেডিং সংক্রান্ত খেলা, ক্রিপ্টো বেসড্ গেম, ফুটবল-সহ জনপ্রিয় ইভেন্টের ভার্চুয়াল গেম এখন মোবাইল স্ক্রিনের একটা ছোঁয়াতেই পেয়ে যাচ্ছে মানুষ। সবচেয়ে বড়ো কথা, খেলা ও চলচ্চিত্র জগতের তারকারা যখন এইসব গেমিং অ্যাপের বিজ্ঞাপন করে, তখন এই জুয়ার নেশায় আরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হন। শাহরুখ খান, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সদ্য প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি থেকে শুরু করে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতিষ্ঠিত তারকা খেলোয়াড়রা বিজ্ঞাপনগুলিতে এইসব মানি গেমিং উদ্যোগ প্রোমোট করেন। অবশ্য বিজ্ঞাপনগুলিতে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণও থাকে। 'খেলাটি ঝুঁকিপূর্ণ, এতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারেন, নিজের রিস্কে খেলুন' ইত্যাদি ইত্যাদি। যা অস্পষ্ট এবং ফাস্ট ফরোয়ার্ড স্পিডে শোনানো হয়। তাতে কী। সে তো সিগারেটের বাক্সেও লেখা থাকে। তা বলে কি কেউ ধূমপান করে না?

এই সমস্ত গেমের পোশাকি নাম রিয়েল মানি গেম। যেখানে পুরস্কারের নামে প্রচুর টাকার প্রলোভন থাকে। স্কিল বেসড্ অথবা চান্স বেসড্ এই সমস্ত জুয়া খেলায় এখন কোটি কোটি টাকা লগ্নি করছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। শেয়ার বাজারের অনুমান, ২০২৫ সালে এই রিয়েল মানি উদ্যোগের ব্যবসা ৫০০ কোটি ডলার পেরিয়ে যাবে। বাজার সমীক্ষায় দেখা গেছে এই সমস্ত রিয়েল মানি গেমসের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তরুণ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা। গড় হিসাবে যারা খুব বেশি উপার্জনক্ষম হয় না। ফলে এই জুয়াখেলায় তাদের একমাত্র উপায় হলো পকেট মানি। তা দিয়ে না চললে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে টাকা ধার করে অনেকে এই গ্যাম্বলিং গেম খেলছে। তাছাড়া যারা অল্প বয়সেই পড়াশোনা ছেড়ে আয় করতে শিখেছে এই জুয়াখেলায় তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। একটা সময় সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মহত্যা করার মতো ঘটনাও ঘটছে আকছার। এরকম অনেক খবর পাওয়া গেছে যেখানে এই অনলাইন জুয়াখেলার পিছনে টাকা ঢেলে পথে বসেছে কয়েকশো পরিবার।

সায়কিয়াট্রিস্টদের মতে, এই বয়সে অল্প সময়ে অনেক টাকা আয় করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। যেকারণে তারা ফাটকা উপার্জনের দিকে ঝোঁকে। রিয়েল মানি গেমসে জেতার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবুও তরুণ প্রজন্ম এই জুয়াখেলায় মগ্ন। ২০২০-তে ড্রিম ইলেভেন ক্রিকেট অ্যাপ ২২২ কোটি টাকা দিয়ে আইপিএলের বিজ্ঞাপনী স্বত্ব কিনে নেয়। তারপর থেকেই তারকাদের ঢালাও বিজ্ঞাপনে তাদের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে তাদের তারকাখচিত বিজ্ঞাপন চোখে পড়ার মতো। বিজ্ঞাপনী কৌশলও অভিনব। সেখানে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী একটা পেল্লায় এসইউভি গাড়ি তুলে দিচ্ছেন উইনারের হাতে। অর্থাৎ এই অনলাইন গেম খেললে জিততে পারেন অতবড়ো একটা গাড়ি! শুধু তাই নয় কোনো গেম খেলতে হাজির হবেন সৌরভ নিজেই। ফেসবুক থেকে শুরু করে সমস্ত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটেই দেখা যাচ্ছে গেমিং অ্যাপের অ্যাড। টিম বানাও, খেলো আর ৫০ কোটি টাকা জেতো। পিছিয়ে নেই অন্যান্য গেমিং প্ল্যাটফর্মগুলিও। শাহরুখ খান বা বুম্বাদার সঙ্গে সরাসরি রামি খেলার সুযোগ! তবে ভার্চুয়ালি। আইকনদের এই হাতছানি এড়াবে কার সাধ্যি!

কিছুদিন আগে এই মানি গেমিংয়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন সাংসদ- ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। ক্রিকেটারদের এই সমস্ত বিজ্ঞাপন থেকে সরে আসার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। সৌরভের মতো আইকনদের এই সমস্ত ক্ষতিকর কনটেন্ট-এর প্রচার থেকে দূরে থাকার কথা বলেন গম্ভীর। সাংসদের আবেদনে কেউই যে তেমন আমল দেননি তা বোঝাই যায় তাদের বিজ্ঞাপনের বহর দেখে। প্রশ্ন হলো, সমাজের এই অবক্ষয়ের দায় কি এড়িয়ে যেতে পারেন সেলিব্রিটিরা? আসলে গড়পড়তা ব্যক্তি উপার্জনের রাস্তাটাই দেখেন। সমাজের কথা ভাবার সময় তাদের নেই। অক্ষম হওয়ার আগে পর্যন্ত যতটা পারা যায় সম্পদ জমিয়ে তোলাই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সবাই তো আর শচিন তেন্ডুলকার নন। যিনি আজীবন একটা ফেস ক্রিম, হার্ড ড্রিংক অথবা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরকম কোনও বিজ্ঞাপন করলেন না। নাহলে অনেক তথাকথিত লেজেন্ড স্যান্ডো গেঞ্জিতে পোজ দিতেও পিছপা হচ্ছেন না।

ইতিমধ্যে বহু রাজ্য এই সমস্ত গেমিং অ্যাপ নিষিদ্ধ করেছে বহু আগেই। পশ্চিমবঙ্গ অবশ্য চিরকালই ব্যতিক্রম। ৬ টাকায় ১ কোটির লটারির মতো এরাজ্যেও মানি গেমিং অ্যাপ বহাল তবিয়তে তার নখ-দাঁত ছড়াচ্ছে। যেখানে প্রতিষ্ঠিত আইকনরা এই জুয়া খেলতে উৎসাহিত করছে সেখানে এই খেলার উপর নিষেধাজ্ঞা লাগু করবে কারা? অন্তত দেশের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই মানি গেমিং উদ্যোগে কিছু লাগাম পরানো উচিত। ফর্ম্যাট কিছুটা রেক্টিফাই করে জুয়ার পরিধিটা তুলে দিলে সাপও মরবে না আর লাঠিও ভাঙবে না।

নিমতায় স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের বিজয়া সম্মেলন

গত ৫ নভেম্বর দক্ষিণবঙ্গ স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার উত্তর দমদম নগরের নিমতা রেণুকা ভবনে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন উত্তর দমদম নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক রমেন ঘোষ। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ছন্দা হালদার(রায়)। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সংযোজক অধ্যাপক নির্মল কুমার মাইতি, স্বস্তিকা পত্রিকার সহ সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের প্রান্ত সহ সংযোজক অশোক পাল চৌধুরী, প্রান্ত সহ সম্পর্ক প্রমুখ কৃষ্ণপদ দেবনাথ, আরোগ্য ভারতীর জেলা প্রমুখ তথা প্রান্ত সদস্য অসিত বরণ আইচ এবং স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পূর্বক্ষেত্রের সহ সংযোজক অম্লানকুসুম ঘোষ। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা ডাঃ অর্চনা মজুমদার।

সম্মেলনে প্রয়াত দুই প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত ও শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হয়। তাঁদের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্কার ও শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে সম্প্রতি রতন টাটার সঙ্ঘের শাখা দর্শনের উল্লেখ করে বিপ্লব রায় বলেন, সঙ্ঘে বালক মুখ্য শিক্ষকের নির্দেশে সরসঙ্ঘচালক পর্যন্ত দক্ষ-আরম করেন।

বিজয়া সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক মাইতি। তিনি বলেন দেশকে পরম বৈভবশালী করার জন্য স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ ভারতব্যাপী ‘ স্বাবলম্বী ভারত অভিযান’-এর কার্যক্রম নিয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো চাকরির মুখাপেক্ষী না থেকে তরুণ-তরুণীদের স্বরোজগার প্রকল্প গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা। শ্রীপাল চৌধুরী স্বদেশীর ধারণা উদাহরণ-সহ বিস্তারিত আলোচনা করেন। শুধুমাত্র বিদেশি জিনিস কেনার ফলে কীভাবে কোটি কোটি টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে তার উল্লেখ করেন প্রান্ত সহ সম্পর্ক প্রমুখ কৃষ্ণপদ দেবনাথ। অম্লান কুসুম ঘোষ বলেন ভারতকে তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হলে স্বদেশী অর্থনীতি গ্রহণ করতে হবে। স্বদেশীই ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের হাতিয়ার। অসিত বরণ আইচ স্বদেশী চিকিৎসা তথা আয়ুর্বেদের চমৎকারিত্ব তুলে ধরেন। সম্মেলনে ১৫০ জন স্বয়ংসেবক ও শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উত্তর দমদম নগরে আরোগ্য ভারতীর একটি শাখা খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠান সুচারু রূপে পরিচালনা করেন এবং ধন্যবাদ জানান স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের উত্তর দমদম নগর শাখা প্রমুখ গোপাল গুহ মজুমদার। রাষ্ট্রগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্ট বীজপুর, তৃতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্ট, বীজপুর গত ২৩ অক্টোবর তাদের তৃতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কাঁচড়াপাড়া রেল ইনস্টিটিউটে। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ব্যারাকপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী অনিষানন্দজী মহারাজ এবং রহরা রামকৃষ্ণ বালক আশ্রমের স্বামী ব্রহ্মতত্ত্বানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, দক্ষিণবঙ্গ সমাজ সেবা ভারতীর সংগঠন সম্পাদক ধনঞ্জয় ঘোষ এবং বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মদন বিশ্বাস। পূজ্য সন্ন্যাসীদ্বয় প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সেবা ট্রাস্টের সদস্যরা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেবা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মদন বিশ্বাস। এরপর দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে ট্রাস্টের বিগত তিনবছরের সেবাকাজের ধারাবাহিকতা উপস্থাপনা করা হয়। পূজ্য দুই সন্ন্যাসী তাঁদের প্রেরণাদায়ী বক্তব্যে আগামীদিনে সমাজ তথা সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে আরও ভালোভাবে সেবা করার পথনির্দেশ করেন।

অনুষ্ঠানে বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের সারথি, ফার্মাসিস্ট এবং সেবাকাজে সহযোগী চিকিৎসকদের বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্ট বীজপুরের স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। সমাজ সেবা ভারতী দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক ধনঞ্জয় ঘোষ তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন অখিল ভারতীয় প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈত চরণ দত্ত। তাঁর প্রেরণাদায়ী ও সুচিন্তিত বক্তব্য সেবা ট্রাস্টের সদস্যদের উৎসাহিত করে। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তাঁতিবেড়িয়া স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির রক্তদান শিবির

তাঁতিবেড়িয়া স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির উদ্যোগে গত ৬ নভেম্বর নিজস্ব ভবনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সেবা সমিতির সম্পাদক সুজিত ব্যানার্জি, সহ সম্পাদক অপূর্ব ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি, হিসাব রক্ষক বিশ্বজিৎ দাস, সঞ্চালক অজয় পাত্র প্রমুখ। রক্তদানে উৎসাহিত করেন কৃষ্ণাশিস বসু ও অশোক মণ্ডল।

শ্রীমতী দৈবকীদেবী সারদা শিশুনিকেতনের বার্ষিক অনুষ্ঠান

মালদহ জেলার গাজোলের অতি গ্রামীণ ক্ষেত্র হরিপুর গ্রামের শ্রীমতী দৈবকীদেবী সারদা শিশুনিকেতনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় গত ৪ নভেম্বর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিশু নিকেতনের পরিচালন সমিতির সভাপতি রামপ্রসাদ সরকার। মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী মালদহ জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অসীম কুমার লাহিড়ী। অনুষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা করেন এলাকার কৃষ্ণভক্ত অধুনা স্পেন নিবাসী ইউরোপ ইসকনের কৃষ্ণনাম প্রচারক দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার। অতিথিগণ দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের পর মাতৃবন্দনা পরিবেশিত হয়। এর পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত

আবৃত্তি সংগীত, নৃত্য সবাইকে মুগ্ধ করে। এছাড়াও সংগীত পরিবেশন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার ও অসীম কুমার লাহিড়ী।

এরপর বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন পরেশ চন্দ্র সরকার। অনুষ্ঠান সুচারু রূপে পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার। সমবেত রাষ্ট্রগীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সিউড়িতে শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

বীরভূম জেলার স্বনামধন্য সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে গত ৬ অক্টোবর সিউড়ি শ্রীভূমি পল্লীর লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জিকে তাঁর বাসভবনেই

শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নবীন সন্ন্যাসী স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। শ্রীমুখার্জিকে মাল্যদান করেন শ্রদ্ধার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে শ্রীমুখার্জিকে নামাবলী, গীতা, পরিধেয় বস্ত্র, ফল ও মিষ্টান্ন প্রদান করা হয়। তারপর তাঁকে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা করেন তাঁর একমাত্র পুত্রবধূ। বক্তব্য রাখেন আগমন আনন্দ মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করে মুখার্জি বাড়ির শিশু সদস্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দামোদর ঘোষাল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের মহারাস মহোৎসব

ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে গত ৬ নভেম্বর রাসপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে অজীমগঞ্জ হাউস পরিসরে খোলা আকাশের নীচে চাঁদের আলোয় মহারাস মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে 'স্পর্শ এবং ধুর্বা' নৃত্যগোষ্ঠীর

ওড়িশি,ভরতনাট্যম্ ও মণিপুরী শৈলীতে রাসনৃত্য উপস্থিত দর্শদের মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে। শুরুতে ড. তারা দুগড় তাঁর স্বরচিত পদাবলী পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠভূমি প্রস্তুত করেন। নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গিমা ও শৈলীর মাধ্যমে শিল্পীদের বালকৃষ্ণ, তরুণকৃষ্ণ ও রাসেশ্বর কৃষ্ণের উপস্থাপনা দর্শকদের ভাববিহ্বল করে তোলে। এক সময় পুরো পরিবেশ কৃষ্ণময় হয়ে ওঠে। শিল্পীদের পরিচয়ের পর সংস্থার অধ্যক্ষ ড. বিট্ঠল দাস মুন্ধা সবাকে ধন্যবাদ জানান। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন সংস্থার কর্মঠ সদস্য সুমন সরাওগী। সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন সিদ্ধার্থ দুধোড়িয়া, রাজগোপাল সুরেকা, বিজয় ঝুনঝুনওয়ালা, রাজেশ দুগড়, শ্রীমতী সংগীতা দুধোড়িয়া। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যায় গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

ধর্ম জিজ্ঞাসা—দুই

অমৃত লাভের অমৃত কথা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

জন্ম নিলেন ধর্ম

তখনও শুরু হয়নি সৃষ্টিযজ্ঞ। ক্ষীরোদসাগরে অনন্ত শয্যায় শায়িত নারায়ণের নাভিদেশ থেকে উত্থিত শতদলে সৃষ্টি হলো কমলাসন ব্রহ্মার। তখনও কর্মরহিত তিনি। একসময় মনে জাগল তাঁর সৃষ্টির বাসনা। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা, প্রজা সৃষ্টি করলে কে রক্ষা করবে তাদের? ব্রহ্মার এই চিন্তনের মুহূর্তে তাঁর ডান হাতের আঙুল থেকে প্রকটিত হলেন এক পুরুষ। শ্বেতাম্বর, শ্বেত কুণ্ডলধর, শ্বেতমাল্য, শ্বেতচন্দন ভূষিত সে পুরুষ।

ব্রহ্মা দেখেন, বৃষের মতোই ওই পুরুষের চারটি পা। বৃষাকৃতি ওই চতুষ্পদ পুরুষকে দেখে পুলকে ভরে উঠল ব্রহ্মার মন। উচ্ছ্বাসভরে বললেন, সাধু তুমি, তোমাকে দিলাম জগতের শ্রেষ্ঠ পদবি। তুমি প্রজা পালন করো। ব্রহ্মার এই নির্দেশে সশ্রদ্ধ চিত্তেই তিনি সেই দায়িত্ব নিলেন। পরিচিত হলেন ধর্ম নামে।

ধর্ম হলেন প্রজাপালক— ব্রহ্মারই আদেশে। বৃষাকৃতি এই ধর্ম সত্যযুগে ছিলেন চতুষ্পদ। অর্থাৎ সত্য বা কৃত যুগে অধর্মের ছিল না কোনো স্থান। ত্রেতায় দেখা দিল অধর্ম। ধর্ম হলেন ত্রিপদ। এই ভাবে দ্বাপরে তিনি দ্বিপাদ এবং কলিতে হলেন একপাদ। অর্থাৎ কলিতে বলবান হলো অধর্ম— তিন পায়ের মালিক হলো অধর্ম, ধর্ম কলিতে মাত্র একপাদ।

বেদে ধর্মকে বলা হয়েছে ত্রিশৃঙ্গ পুরুষ। প্রথমে ও শেষে রয়েছে তাঁর ওঁকার। তিনি দ্বি-শির অর্থাৎ মাথা দুটি, হাতের সংখ্যা সাত। ওই রূপেই নিষ্ঠার সঙ্গে প্রজাপালন করে চলেছেন ধর্ম। তাঁর এই কর্মেই পরিচালিত হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড।

বরাহপুরাণের পাতায় এই ভাবেই চিত্রিত ধর্ম। এখানে তিনি সম্পূর্ণভাবেই এক পৌরাণিক দেবতার রূপ নিয়েছেন। এই ধর্মের প্রভাবেই জাগে আত্মজিজ্ঞাসা— যার সমাপ্তি ধর্ম জিজ্ঞাসায়।

চিরন্তন জিজ্ঞাসা—কে আমি?

'কস্ত্বং? কোহহং কুত আয়াতঃ'— কে আমি? কোথা থেকে এলাম? যাবই-বা কোথায়? এই সর্বজনীন জিজ্ঞাসাই রূপ পেয়েছে শংকরাচার্যের চর্পটপঞ্জরিকায় এই ভাবে। এই প্রশ্নেরই অন্যরূপ প্রতিভাত রবীন্দ্রকবিতায়, 'প্রথম দিনের সূর্য/প্রশ্ন করেছিল/সত্তার নতুন আবির্ভাবে/কে তুমি?/মেলেনি উত্তর।/ বৎসর বৎসর চলে গেল।/দিবসের শেষ সূর্য/শেষ প্রশ্ন উচ্চারিত/পশ্চিম সাগরতীরে/নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়/কে তুমি?/পেল না উত্তর।'

একক চিরন্তন জিজ্ঞাসা। যুগ-যুগান্তরের উৎস থেকে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে প্রবহমান এই একই জিজ্ঞাসা। তাত্ত্বিকরা বলেন, এটাই হলো আত্মজিজ্ঞাসা। ধর্মের উৎসক্ষেত্র এটিই। উৎস থেকে উৎসারিত জলরাশি

যেভাবে প্রবাহিত হয় শত ধারায়, সেই ভাবেই এই জিজ্ঞাসাও শতধা। এর আদি নেই, অন্তও নেই। তাই মানুষ তার আপন বোধে সৃষ্টি করে চলেছে— নানা মতবাদের। তাদের কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এবং উঠছে নানা ধর্ম, যাকে এক কথায় বলা যায়— সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীভিত্তিক ধর্ম।

এই জিজ্ঞাসাকে যেভাবে আমল না দিয়ে অনেকে আবার বলেন, প্রকৃতির বুকে নিত্য চলেছে যে নানা লীলা, আদি মানবের মনে তা সঞ্চার করেছিল একধরনের ভীতি ও বিস্ময়। সেটাই বহমান নানা ধর্মের প্রবাহে। সেটাই সব ধর্মের উৎস।

মত আরও আছে। অনেকেই আছেন যাঁরা কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী নন। আবার কেউ কেউ তো সরাসরি ধর্মের অস্তিত্বেই অবিশ্বাসী। এইসব মতবাদ এবং সত্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, একটা যে আড়াল খাড়া হয়ে আছে তা দৃশ্যমান নয় তাঁদের কাছে।

অথচ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ধর্ম ছাড়া কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। কথাটা কোনো ধর্মাচারীর নয়, এ হলো একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। বিজ্ঞানীরা দৃঢ়ভাবেই ঘোষণা করেছেন, প্রতিটি বস্তু অথবা পদার্থেরই রয়েছে বিশেষ বিশেষ ধর্ম। সেই সব বস্তু বা পদার্থের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে যে জীবদেহ— আরও রয়েছে, তাই কিছু এল নিজস্ব ধর্ম। বুদ্ধিবৃত্তির নিরিখে মানুষ জীবজগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী। সে কারণেই মানুষের মধ্যে সদা বিরাজমান যে ধর্ম— তা অনেকটাই জটিল। বহুমুখী প্রশ্নের তীক্ষ্ণ শলকায় ধর্ম তাই নিরন্তর বিক্ষত হয়ে চলেছে। পরিণামে নতুন নতুন মতবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক একটি ধর্ম। অন্তরলোকের আলোক প্রবাহে সব মানুষই একই ধর্মের অনুসারী। কিন্তু অহংবোধ বা সকলের উপর প্রভুত্ব করার এক সংকীর্ণ বাসনাই মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এক একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অনুদার, সংকীর্ণ অন্ধকার বিবরে।

মানুষের মধ্যে যে ধর্ম রয়েছে— তার কিছুটা প্রকৃতি যা স্বভাবজাত এবং কিছুটা অর্জিত। স্বভাব বা প্রকৃতিজাত ধর্মের গুণে বিশ্বের সব মানুষই কিছু সাধারণ ভাবনাচিন্তার রঙে রঞ্জিত। আবার নানাভাবে অর্জিত জ্ঞানের তারতম্য মানুষের মধ্যে দেখা দেয় বেশ কিছু অবিশ্বাস এবং গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের অনিশ্চয়তার আড়াল। তারই ফলে স্বভাবে এক হয়েও মানুষ আজ নানা গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব-মুখর।

সহজাত ধর্ম

মানুষমাত্রই জন্মায় কিছু সহজাত ধর্ম নিয়ে। এক্ষেত্রে মানুষে মানুষে নেই কোনো ভেদাভেদ। এই সহজাত অথবা প্রকৃতিগত ধর্মের কারণেই শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই কতগুলি বিশেষ স্বভাব অথবা ধর্মের অধিকারী। আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যম সকলেরই এক। হাসি-কান্নার দোলদোলানি সকলের জীবনকেই দেয় এক বিশেষ অনুভূতির সন্ধান। এইসব অনুভব জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকলেরই একরকম। সুখানুভূতির হাসি অথবা শোক বা বেদনাজনিত কান্না থেকে মানুষকে চিহ্নিত করা যায় না কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মের অনুসারী হিসেবে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, এই জীবদেহ গঠিত একই উপাদান দিয়ে। এই কারণেই স্বভাব-ধর্মে প্রতিটি মানুষেরই প্রতিক্রিয়া এক।

হিন্দু দর্শন মতে, পঞ্চভূতে গড়া এই মানবদেহ। এই পঞ্চভূতের নাম,— ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ ও ব্যোম। অথাৎ মাটি, জল, তেজ অর্থে অগ্নি, বায়ু ও আকাশ বা অন্তরিক্ষ। পঞ্চভূতের আধার এই মানবদেহের বিলীন হয় সময়শেষে পঞ্চভূতেই। জ্ঞানতত্ত্বে, এই দেহ হলো একটি সাময়িক অবলম্বন। এই অবলম্বন বহিরঙ্গে বহু— কিন্তু অন্তরঙ্গে এক। এই দেহ আধার, যাকে বলা হয় দেহমন্দির, তার অধিষ্ঠাতা হলো আত্মা। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ এই আত্মার কারণেই মানুষের বাহ্যিক সব ব্যবহার। মানুষের দেহের বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় আছে এবং আছে মৃত্যুও। কিন্তু এই দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে যে আত্মা তা কিন্তু অবিনাশী। দেহের মৃত্যু— একটি সত্য। কিন্তু দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মার কোনো মৃত্যু হয় না।

এই যে তত্ত্ব— তার সঙ্গে বিজ্ঞান ও দর্শনেরও সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। বিজ্ঞানে আত্মা অর্থে ব্যবহার করা হয় 'শক্তি' শব্দটি। বিজ্ঞান বলে শক্তির বিনাশ নেই, আছে রূপান্তর। অর্থাৎ এক শক্তি রূপান্তরিত হয় অন্য একটি শক্তিতে। রূপান্তর হলেও মূলে কিন্তু থাকে একই শক্তি।

গীতায় এই কথাটি বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়েছে অত্যন্ত সাধারণ এবং ঘরোয়া একটি উপায়। জামাকাপড় পুরনো হয়ে গেলে বা ছিঁড়ে গেলে মানুষ তা ফেলে দিয়ে নতুন জামাকাপড় পরে। তাতেই তার আনন্দ। একই ভাবে আত্মার আধার এই মানবদেহ জীর্ণ হলে আত্মাও সেই জীর্ণ, পুরনো দেহ পরিত্যাগ করে নতুন একটি দেহকে আশ্রয় করে। অর্থাৎ যেটাকে মৃত্যু বলা হচ্ছে, তা হয় দেহের, আত্মার নয়। বস্তুত আত্মা অবিনশ্বর। পুরনো জামাকাপড় বদলের মতোই সে শুধু এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে বাসা বাঁধে। আর নতুন জীবন নিয়ে তার এই আবির্ভাবকেই বলা হয় জন্ম।

বাসা ও বাড়ির মধ্যে যে পার্থক্য— এটাও অনেকটা সেই রকম। এক একটি দেহ বা জন্মার্জিত কলেবর হলো আত্মার আস্থায়ী আশ্রয় বা বাসা। ইহজীবনের সাময়িক ঠিকানা।

অথচ সাধারণ ধারণা, বুঝি এই দেহটাই আত্মা। কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন জাগে আত্মজিজ্ঞাসা— কে আমি? তখনই হয় জ্ঞানের উদয়। মানুষ বুঝতে পারে— এই দেহ হলো একটি রথ অথবা বাহনমাত্র। প্রকৃত রথী হলো আত্মা। কঠোপনিষদের ভাষায়, 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীর রথমেব তু।/বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।' (১।৩।৩)। নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম এই ভাবে আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেন, শরীরে অবস্থিত আত্মা হলো রথী। আর শরীরটা রথ। এই দেহরথের সারথির নাম বুদ্ধি এবং প্রগ্রহ বা লাগাম হলো মন।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে এই কথাই বিশদে ধ্বনিত বিদূর ভাষণে। সেখানে বলা হয়, মানবদেহ হলো রথ। আত্মা তার চালক। ইন্দ্রিয়গুলি সে রথের অশ্ব। প্রশিক্ষিত মনই সুন্দরভাবে যে রথ চালাতে পারে। জীবনের এই যাত্রা হোক শান্তির পথে, এমনটাই প্রার্থনা সকলের।

মানুষের দেহকে শুধু রথ নয়, মন্দির বলেও উল্লেখ করা হয়েছে ঋগ্বেদের এক সূক্তে বলা হয়েছে যার কাব্যরূপ হলো—

এ দেহই মন্দির—
এই সত্যে চেতনার দীপ জ্বালি
যাঁরা সতত ভাস্বর,
অন্তরের পূর্ত প্রদীপ্ত শিখায়—
দেহ দেউল ক্রম আলোকিত।
সাম্যের অর্জিত অভিজ্ঞতায়
পূর্ণতার সমুজ্জ্বল বিভায়
জীবন-রহস্যের কৃষ্ণ যবনিকা
হয় উত্তোলিত।

কেবল বেদে নয়, উপনিষদ-সহ বেদান্তের নানা গ্রন্থেই দেহকে 'মন্দির' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু দেহই নয়, প্রতিটি স্থানই দেবমন্দির, এমন কথাও আছে বেদান্তে।

জীবদেহে স্থিত আত্মাকেই বলা হয় ঈশ্বর বা পরমাত্মা। ঈশোপনিষদের মতে, 'যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি...' (৬-৭)— যাঁরা তৃণ থেকে সমস্ত ভূতকেই নিজের আত্মাতে দর্শন করেন, তাঁর নির্ভয়— দুঃখহীন। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও ভিন্ন ভঙ্গিমায় বলা হয়েছে ওই একই কথা। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে...' (৩।৩।১) —যা থেকে প্রাণের জন্ম এবং বিলীনও যাতে— তাই ব্রহ্ম, তাই ভগবান।

দেহই মন্দির

ভগবানই সমস্ত জীবের আত্মার আত্মা— হরির্হি সাক্ষাৎ ভগবান শরীরীনামাত্মা— (ভাগবত ৫।১৮।১৩)। আর সে কারণেই আত্মার আশ্রয়স্থল দেহকে বলা হয় মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, মানুষের অন্তর হলো ভগবানের 'বৈঠকখানা'। অন্তরস্থিত সেই দেবতাকে জাগিয়ে তুলে দেবত্বে উন্নীত হওয়াটাই হলো মানুষের সাধনা। যতক্ষণ অহং বা অস্মিতাবোধ অর্থাৎ আমিই— সব বোধ দেহসর্বস্ব জীবনযাপন করা হয়, ততক্ষণ মানুষ পশুত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। এই দেবত্ব অর্জনই ভারত-ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনা।

এই দেবত্ব বলতে যদি সতত সুখসাগরে নিমজ্জিত স্বর্গলোকবাসী দেবতার কথা মনে করা হয়, তবে তা হবে একটা ভুল সিদ্ধান্ত। কেননা, স্বর্গবাসী দেবতারাও অমর নন। তাঁদের সে জীবনও অনিত্য এবং মুক্তিপ্রদ নয়। সে কথাটাই স্পষ্ট করে গীতায় বলা হয়েছে। (৯।২০০২১), যাগযজ্ঞ ইত্যাদি পুণ্যকর্মের কারণে মানুষ দেবলোকে যায়, কিন্তু অর্জিত পুণ্যক্ষয় হলে আবার মর্ত্যদেহ ধারণ করতে হয়। জন্ম নিতে হয় এই মাটির পৃথিবীতে— মানুষ হিসেবে। অর্থাৎ দেবতারা অমর নন। মোক্ষলাভ তাঁদেরও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। আর একমাত্র মানবদেহই জ্ঞান ও ভক্তিযোগের পথে মোক্ষসাধনার উপযোগী বলে দেবতারাও মানুষরূপে মরলোকে আসতে চান। কেননা, তাঁরা জানেন, ব্রহ্মপ্রাপ্তিই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র উপায়।

যম-নচিকেতা সংবাদ

পুরাকালে ঋষি বাজশ্রবস-পুত্র নচিকেতা সশরীরে যমলোকে গিয়ে স্বয়ং ধর্ম যমরাজের কাছ থেকে অমৃতত্ব লাভের পথ ব্রহ্মবিদ্যা আহরণ করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। পরে সাধারণ মানুষকে নচিকেতা আহৃত ব্রহ্মবিদ্যার সন্ধ্যান দিতেই অবতারণা করা হয় ওই নাটকীয় পরিস্থিতির। ঋগ্বেদে (১০।১৩৫) প্রথম পাওয়া যায় এই নাটকের বীজ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও আছে এর উপস্থাপনা। তবে কঠোপনিষদে তা যেন পেয়েছে চরম পরিণতি।

পুরাকালে ঋষি বাজশ্রবস যজ্ঞফল কামনায় বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞশেষে তাঁর সর্বস্ব দান করেন। ঋত্বিক ও ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেওয়ার জন্য বহু গাভী আনেন। কিন্তু সেগুলি দেখে বিচলিত হন শ্রবসের বালকপুত্র নচিকেতা।

একী! গাভীগুলি যে সব অস্থিচর্মসার, বৃদ্ধ, সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। এমন দানে তো পিতা কাঙ্ক্ষিত ফল পাবেন না, বরং ইহলোকে নিন্দিত হবেন। নানা দুর্ভোগ সংকটের ঝড় উঠবে তাঁর জীবনে। পুত্র হিসেবে এহেন পাপ থেকে পিতাকে নিষ্কৃতি দিতে নচিকেতা এক অভিনব পথ নিলেন।

বাজশ্রবসকে বলেন নচিকেতা, বাবা, তুমি তো তোমার সব প্রিয় জিনিসই দান করবে এ যজ্ঞে। তাহলে আমাকে দিচ্ছ কাকে?

ছেলের অদ্ভুত প্রশ্নে শান্তভাবেই বলেন বাজশ্রবস, সত্যিই তুমি আমার প্রিয় ছেলে, কিন্তু তোমাকে দান করার প্রশ্নই ওঠে না।

বাবার কথায় ক্ষান্ত হন না নচিকেতা। বারবার সেই একই প্রশ্ন। শেষে এক চরম মুহূর্তে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন বাজশ্রবস, তোমাকে যমের হাতে দিলাম। বাবা যে রেগে গিয়ে একথা বলেছেন, তা বোঝেন নচিকেতা। তবুও পিতৃবাক্যের মর্যাদা রাখতে তাঁর অনুমতি নিয়েই যমালয়ে যান তিনি।

যম তখন ছিলেন না সেখানে। তাই অনাহারে অপেক্ষা করতে থাকেন নচিকেতা। তিন দিন পরে ফিরে যম শোনেন সব। অতিথি অনাহারে রয়েছে বলে ক্ষমা চেয়ে তিনটি বর দিতে চান যম। সেই মতো প্রথম বরে নচিকেতা চান পিতার প্রসন্নতা। দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করেন অগ্নি বিদ্যা। দুটি প্রার্থনাই পূরণ করেন যম।

প্রসঙ্গত, নচিকেতা জানতে পারেন অগ্নিবিদ্যার সাহায্যে স্বর্গলাভ হলেও অমরত্ব পাওয়া যায় না। স্বর্গবাসী দেবতারাও পান আপেক্ষিক অমরত্ব। কালান্তে মৃত্যু হয় তাঁদেরও। তাই এ বর পেয়ে খুশি নন নচিকেতা। তৃতীয় বরে তিনি তাই আত্মার স্বরূপ জানতে চান।

যম কিন্তু এবার রাজি হলেন না। এযে অত্যন্ত গূঢ় তত্ত্ব। সকলকে তো দেওয়া যায় না এর সন্ধান। বিচার না করে এই বিদ্যা প্রকাশ করলে তো বিপরীত ফল হতে পারে। তাই তিনি এবার নিলেন পরীক্ষার পথ। প্রলোভনের নানা দুয়ার খুলে নচিকেতাকে তিনি এবার বলেন অন্য কোনো বর নিতে। কিন্তু নচিকেতা শত প্রলোভন উপেক্ষা করে আত্মার স্বরূপ জানার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকেন। তাঁর এই চারিত্রিক দৃঢ়তা ও লোভহীন সংকল্পের কাছে হার মানেন যম। নচিকেতাকে তিনি আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেন।

সেই উপদেশের পরম কথাটি রয়েছে কঠোপনিষদের প্রায় অন্তিম শ্লোক— 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ—' ইত্যাদিতে (২।৩।১৭)। যার সারকথা— সমস্ত মানুষের হৃদয়ের আত্মরাত্মা এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই সমস্ত জীবের হৃদয় ও বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মাই স্বরূপত পরমাত্মা। ইনি শুদ্ধ—জ্যোতির্ময়। ইনিই অমৃত— দেশকালের অতীত। এই আত্মার উৎপত্তি কিংবা বিনাশ কোনোটাই নেই। মানুষ মরণশীল। কিন্তু আত্মাকে সুদ্ধ অমৃতময় পরমাত্মা বলে উপলব্ধি করলে স্বভাবের পরিশুদ্ধির মধ্য দিয়ে তিনি অমৃত হন— এই দেহেই ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করেন।

এই উপলব্ধির কথাই আছে ভাগবত পুরাণে। উদ্ধবকে উপদেশ দেওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'সর্বং ব্রহ্মাত্মকং...' (১১।২৯।১৮২২) অর্থাৎ এই জগতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এই বোধটা স্বাভাবিকভাবে আসে না। আত্মবুদ্ধিতে ব্রহ্মভাবের অভ্যাস করতে থাকলে হয় জ্ঞানের উদয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ব্রহ্মময় জগতের অস্তিত্ব। সেই দর্শন বা উপলব্ধি ঘটার পর থাকে না কোনো সংশয়। অবসান হয় সব সন্দেহের। সাধকের তখন সবকিছুতেই ঘটে ঈশ্বর দর্শন। তিনি হন বীতমোহ। বীতশোক। ঘুচে যায় সংসারের সব আসক্তি।

এই প্রসঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ শোনান সেই পরমকথা, —সর্বজীব ও সর্ব পদার্থেই রয়েছেন ঈশ্বর। সেই বোধে তদগত চিত্ত হওয়ার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরলাভ ঘটে, পাওয়া যায় ব্রহ্মের সাযুজ্য। মরণশীল মানুষও হয় অমৃতময়।

□

বাঙ্গলার সর্বাধিক পূজিতা মাতৃদেবতা

দেবী মনসা

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু দেব-দেবীর পুজো ও পালাপার্বণের স্ট্যাটিসটিক্স যদি নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে, বঙ্গদেশের সর্বাধিক পূজিতা অথবা সর্বাধিক মান্য দেবী হলেন মা মনসা। জলজঙ্গল, কৃষিভূমি ও নদ-নদী পরিবেষ্টিত বঙ্গদেশে সর্পদংশনে মৃত্যু এবং তা থেকে কৌমসমাজের তীব্র ভীতিই দেবী মনসাকে করে তুলেছে সর্বমান্য। আর সর্বাধিক উপাস্য পুরুষ দেবতা হলেন ভগবান শিব। তিনি বাঙ্গলার কৃষিদেবতা হিসেবেও আরাধ্য। তাই 'ধান ভানতে শিবের গীত'। কৃষির সুবাদে শিব প্রচলিত হয়ে গিয়েছেন বাঙ্গলার কৃষ্টিতে। শ্রাবণ মাসে এই দুই দেব ও দেবীর পুজো, ব্রতকথা ও জাঁতাল উৎসব। এই লোকায়তিক ভাবনা প্রমাণ করে, ধান্যোপজীবী বাঙ্গালির কৃষিকাজে শিব ও মনসাকে সন্তুষ্ট করা চাই। দুধে-ভাতে তবেই সন্তানকে পালন করতে পারবে বাঙ্গালি। মনসা ভাসান আর শিবতুষ্টি এই কারণেই।

মনসামঙ্গল কাব্যে নানান সাপের কথা আমরা পাই। তার বাইরে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও সর্পবৈচিত্র্য চোখে পড়ে। এই সমস্ত সাপ বাঙ্গলার ঘরে-বাইরে নিত্যদিন চরে বেড়ায়। তা থেকে বাঁচতে মানুষের সচেতন ও অবচেতন প্রচেষ্টার মধ্যে সর্পসংস্কৃতি বা Snake-lore প্রাণ পায়।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে সর্পবৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে— ''কেউটে খরিশ কালী গোখুরা ময়াল। বোড়া চিতি শঙ্খচূড় সূঁচে ব্রহ্মজাল।। শাঁখিনী চামর কোষা সূতার সঞ্চার। খঁড়ীচোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার।। তক্ষক উদয়কাল ডারাশ কানাড়া। লাউডগা কাউশর কুয়ে বেতাছাড়া।। ছাতাড়ে শীয়রচাঁদা নানাজাতি বোড়া। ঢেমনা মেটেলী পুঁয়ে হেলে চিতি ঢোঁড়া।। বিছা বিছুপিঁপিড়া প্রভৃতি বিষধর। সৃষ্টির জোড়ে জোড়ে গড়িল বিস্তর।।' এখানে কোবরা গ্রুপের কেউটে (Indian Cobra), খরিশ/গোখরো (Common Cobra), শঙ্খচূড় (King Cobra), সাপের মতো বিষধর সাপের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া এখানে বিষধর শাঁখিনী (Banded Crait), শীয়রচাঁদা (কালো কালাচ Black Crait), বোড়া (চন্দ্রবোড়া Russells Viper)-র মতো তীব্র বিষধর সাপের কথা পাওয়া যাচ্ছে। এ সকলই বাঙ্গলার সর্পবৈচিত্র্য। এছাড়া এখানে নাম পাওয়া যাচ্ছে নির্বিষ ও স্বল্পবিষধর নানান সাপ, যেমন ময়াল (Rock Python), অজগর (Common Python), বোড়াচিতি (Wolf Snake), ডানাশ (Rat Snake), কানাড়া বা কাঁড় (Common Cat Snake), লাউডগা (Whip /Vine Snake), বেতাছাড়া (Bronze Back Snake), মেটেলি, পুঁয়ে (Common Blind Snake), হেলে (Stipped Keelback), ঢোঁড়া (Checkered) ইত্যাদি।

সাপের দেবী মনসা। দেবী মনসার মূর্তিভাবনার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। আদিতে সাপ নামক প্রাণীটিই পূজিত হতো। তারপর এল সাপের অবয়বে সর্পচালি রেখে পূজা। এটাই হলো জুমর্ফিক ফর্ম। আজকের মনুষ্যমূর্তির মনসা বা অ্যান্থ্রোমর্ফিক দেবীর উদ্ভব অনেক পরে। এরমাঝে যে মূর্তিভাবনা তাতে সাপের অবয়বের মিশেল। যে মনসাঘটে বা মনসা চালায় দেবী আবক্ষ মানবীরূপী, আর নিম্নভাগে সর্পের মতো দেহ, তাকে বলা হয় থেরিয়োমর্ফিক মূর্তি। সাপ এক ভয়ংকর সুন্দর প্রাণী। লোককবি সাপের সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছিলেন বলেই না মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় দেবী নানান সাপে সজ্জিতা। কোনো সাপ তাঁর গলার হার, কোনো সাপ তাঁর কাঁচুলি, কোনোটি হাতের বালা। এই নান্দনিকতা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। সাপ পৃথিবার প্রায় সর্বত্র লভ্য। লভ্য কৃষিবাস্তুতন্ত্রে। বাঙ্গলার জমিজিরেতে, জলেজঙ্গলে সাপের অহরহ আনাগোনা ছিল। ছিল সর্পাঘাতে মৃত্যুর ঘটনা। ভয়ে-ভক্তিতে মানুষ সাপকে পুজো করতে শুরু করল— শুরু হলো সর্প-চারণা। দেবী মনসা হলেন বাঙ্গালি হিন্দুর সর্প-চারণার এক চরম আধ্যাত্মিকতা, নান্দনিক দার্শনিকতা। □

অনুচ্চারিত ইতিহাসের রসহ্যভেদ

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

(গত সংখ্যার পর)

নেহরু ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত উভয়েই মনে করতেন যে 'কোল্ড ওয়ার' রেজিমে ভারতের উচিত নিরপেক্ষ থাকা। অথচ ১৯৫০ সালে চীনের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে নেহরুর তরফ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপটি থেকে ভারত যে ক্যাপিটালিস্ট আমেরিকা অপেক্ষা কমিউনিস্ট চীনের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থেই ভারত সেইসময় নিরপেক্ষ ছিল না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে নেহরু মনে করেছিলেন মার্কিন প্রস্তাবে সম্মত হয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হলে ১৯৫০-১৯৫৩ পর্যন্ত চলা কোরিয়া যুদ্ধে ভারত নিরপেক্ষ থাকতে পারত না যার ফলে নন-অ্যালাইন মুভমেন্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো। কিন্তু এই সকল যুক্তি যে অসার বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা বোঝা যায়। ইউএনএসসি'র সদস্য হয়েও নন-অ্যালাইন থাকা যায়, সাম্প্রতিক ইউক্রেন যুদ্ধের সময় ইউএনএসসি'র অস্থায়ী সদস্য হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর ভারত তা বুঝিয়ে দিয়েছে। উপরন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের প্রত্যেকের থাকে ভেটো পাওয়ার যা প্রয়োগ করে যে কোনো যুদ্ধ থামানোর ক্ষমতা কাগজে-কলমে প্রতিটি স্থায়ী সদস্যের থাকে। অর্থাৎ নেহরু হয়তো আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে তিনি ভেটো দিয়ে কোরিয়া যুদ্ধ থামাতে চাইলেও সে প্রয়াস কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকত। চীন তাতে নিবৃত্ত হতো না, বরং রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়েও ভারতের ভেটো পাওয়ার যে তেমন কার্যকরী নয় তা প্রমাণিত হয়ে যেত। আবার প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে গেলে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রটিতে যতখানি শক্তিবৃদ্ধি ভারতকে করতে হতো এবং তার জন্য যে পরিমাণ খরচ হতো সেই খরচের ভার সামলাতে ভারত পারবে না বলেই হয়তো মনে করেছিলেন নেহরু। অর্থাৎ ভারত দেশকে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং চীনের সঙ্গে তুল্যমূল্যভাবে শক্তিশালী করে তুলতে পারবেন না মনে করেই হয়তো ইউএনএসসি'র সদস্য হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেননি নেহরু। অপারগতা ঢাকতে নন অ্যালাইন মুভমেন্টের কথাটি হয়তো 'ছুতো' হিসেবে মুখরক্ষা করেছিল তাঁর।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময়ে পারচেস পাওয়ার প্যারিটির নিরিখে ভারতের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট যেখানে ছিল বিশ্বে চতুর্থ, সেখানে নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বে বছরে বছরে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ১৯৫৬-তেই তা হয়ে যায় বিশ্বে অষ্টম। অর্থাৎ নেহরুর ১৭ বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ভারতের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের আপেক্ষিক বৃদ্ধি গোটা ভারতে সম্পদের আপেক্ষিক হ্রাসের আদত কারণ কী ছিল? কেন প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে শক্তিবৃদ্ধি করার ক্ষমতা ভারতের ছিল না বলে মনে করেছিলেন নেহরু? তবে কি ব্রিটিশ আমলের মতো নেহরুর আমলেও দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার হওয়া বন্ধ হয়নি? প্রশ্ন অনেক এবং উত্তর পাওয়াও সহজ নয়। সেই তুলনায় নরেন্দ্র মোদীর ভারতের জিডিপি পারচেজ পাওয়ার প্যারিটির নিরিখে বর্তমান বিশ্বে তৃতীয়

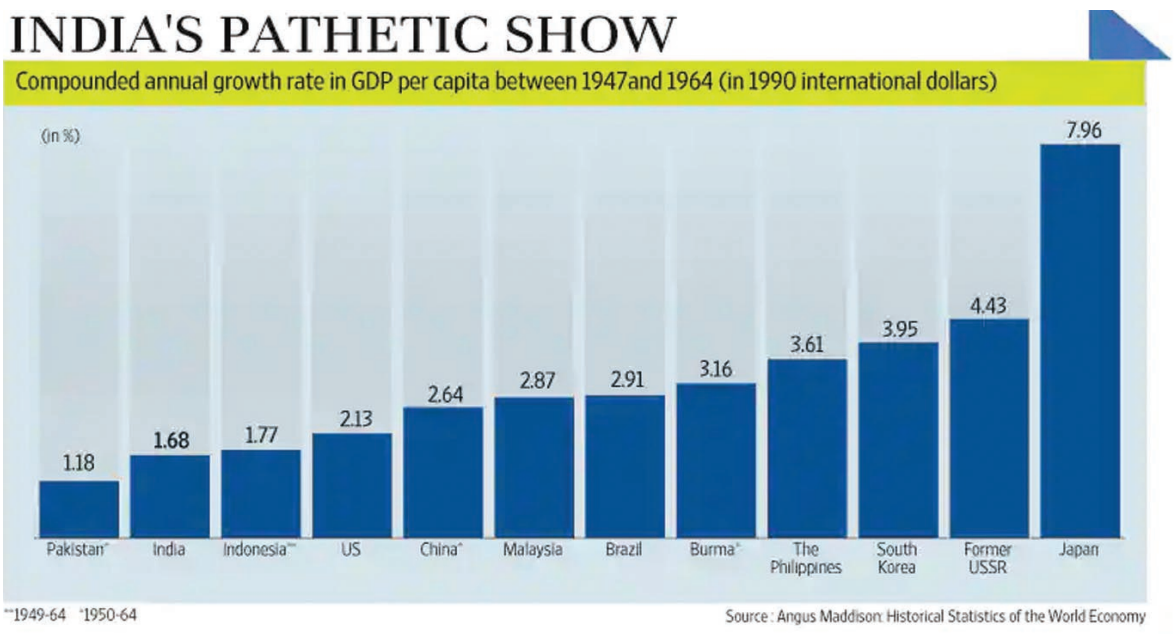

ফ ও ৫

স্থানাধিকারী এবং এই ভারত দ্রুতগতিতে শক্তিবৃদ্ধি করছে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও এবং ক্রমশ হয়ে উঠছে ডিফেন্স সেক্টরে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ১৯৫০, ১৯৫৩ বা ১৯৫৫-র মতো পিছু হঠার জায়গায় বর্তমানের ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে নেই।

এদেশে কমিউনিজম প্রসারে বিশেষ ধূর্ত ভূমিকা নিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। সেলুলার জেলে রাখা শুরু করেছিল কমিউনিজমের পত্রপত্রিকা। জেলে থাকা হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎদের মাথায় সেইসব পত্রপত্রিকার মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে গোঁজা হয়েছিল কমিউনিস্ট ধ্যানধারণা, শুরু করা হয়েছিল কমিউনিস্ট ব্রেইনওয়াশ। হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে আগুনে পুড়তে হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারকে, সেই আগুন নিভিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতিমুখকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করেছিল ব্রিটিশ সরকার। কারণ তার দ্বারা ব্রিটিশ সরকারবিরোধী আন্দোলনকে শ্রেণীশত্রু বিরোধী আন্দোলনে পরিণত করে আন্দোলনের ফোকাল পয়েন্টটি পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসক। ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎদের অনেককেই দেখা গিয়েছিল সেলুলার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কমিউনিস্ট আন্দোলনে সরাসরি যোগদান করতে। অর্থাৎ জেল থেকে ছাড়া পাওয়া ব্রেইনওয়াশ বিপ্লবীদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের প্রয়োজনই এ দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিতে হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারকে।

১৯৩৬ সালের পর থেকে মার্কসিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন নেহরুও। পরবর্তীকালে তাঁর নির্ধারিত অর্থনৈতিক নীতিগুলিও ছিল মূলত মার্কসীয় নীতি। উপরন্তু ১৯৩৭ সালে নেহরু যখন লন্ডনে, তখন সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন জ্যোতি বসু। 'First let the country be independent, then you decide whether you want to be communist or Socialist.' This was the advice Jawaharlal Nehru gave me in 1937 when I met him for the first time in London. I was general secretary of an organisation called London Majlish and had just completed a year of my journey in the world of Communism. –লিখেছিলেন জ্যোতি বসু নেহরুর ১১৬ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। অর্থাৎ নেহরু একপ্রকার আশ্বাসই দিয়েছিলেন জ্যোতি বসুকে যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কমিউনিস্ট রাজনীতির পথে কোনো বাধা থাকবে না। অতঃপর ১৯৪০-এ জ্যোতি বসু ফিরে আসেন ভারতে এবং যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ায়। অর্থাৎ নেহরু, কমিউনিজম, মার্কসিজম, জ্যোতি বসু--- নীতিগত ও ভাবগতভাবে একই জগতের অঙ্গ এবং এই ভাবজগতটির সঙ্গে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কোনো প্রকৃত সংঘর্ষ ছিল না। উপরন্তু ব্রিটিশ সরকার এও বুঝেছিল যে ভারতকে প্রকৃতই নষ্ট করতে হলে দেশটিকে তার সনাতন পন্থার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন। ভারতের সনাতন ভাবজগতকে নষ্ট করে সে দেশের মানুষের মন ঔপনিবেশিকতার গ্লানিতে চিরতরে আচ্ছন্ন করে সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর দখল চিরতরে কায়েম রাখার বাসনা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের থাকা আশ্চর্যজনক কিছু ছিল না। এবং ভারতকে তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হলে কমিউনিজম যে সেই লক্ষ্য পূরণের এক অতি উৎকৃষ্ট পন্থা, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ তা উপলব্ধি করেছিল বহু আগেই। কাল্পনিক এক সংঘর্ষপ্রবণতায় ভারতের জনগোষ্ঠীকে চির আচ্ছন্ন রাখতে পারলে ভারতের সম্পদ চিরকাল লুঠ করে যাওয়ার সুযোগ ও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। উপরন্তু নেহরুর মতো মানুষের ওপর এ বিষয়ে ভরসা করতে ব্রিটিশ সরকার পারত, কারণ নেহরু ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞান-বুদ্ধিতে, চলন-বলনে, আচার-ব্যবহারে, পোশাকআশাকে ভারতীয় তত ছিলেন না যতখানি ছিলেন ব্রিটিশ। নিজেকে তিনি ভাবতেও চাইতেন ব্রিটিশ হিসেবেই। তাছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় জওহরলাল নেহরুর যে সকল ছবি দেখতে পাওয়া যায়, তাতে তিনি ব্রিটিশপ্রেমী এবং ব্রিটিশের মোসাহেব ব্যক্তিত্ব বলেই প্রতীত হন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর শরীরী ভাষা আর জওহরলাল নেহরুর শরীরী ভাষা পরস্পর বিপরীতধর্মী। নেতাজীর চোখের দৃষ্টি ও শরীরী ভাষায় ব্যাঘ্রসদৃশ বীরত্ব, আত্মবিশ্বাস আর সাহস যেখানে জওহরলাল নেহরুর চোখের দৃষ্টি ও শরীরী ভাষায় স্বার্থপরতা, সুযোগসন্ধানী ধূর্ততা এবং ব্রিটিশের মোসায়েবি মানসিকতার প্রকাশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন ব্রিটিশ রমণীর সঙ্গে যে ভঙ্গিমায় নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন নেহরু, ভারতীয়দের পক্ষে তা অগৌরবের। তবে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর এমন বর্ণনাও নিশ্চিত ভাবেই ভারতীয়দের জন্য গৌরবজনক নয়। কিন্তু এমন বর্ণনা সত্যের খাতিরে। নেহরু সেই ব্যক্তি যিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে কেবলমাত্র নিজের ভোটটি ছাড়া আর কারুর ভোট না পেয়েও গান্ধীজীর সুপারিশে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এমন কাজ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব না হলেও জওহরলাল নেহরুর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অতএব ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও ব্রিটিশের গোপন নির্দেশে ভারতে কমিউনিজমের প্রসার অব্যাহত রাখতে রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে তদ্বির করা নেহরুর পক্ষে সম্ভব ছিল।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সালে সংবিধান কার্যকর হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল রাজা পঞ্চম জর্জ ও ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অধীনস্থ ডমিনিয়ন অব ইন্ডিয়া, যে ডমিনিয়নের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহরু। এমন একটি সময়কালে, বস্তুত, এক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর পদে অভিষিক্ত থাকার ফলে ভারতীয় হিসেবে নেহরুর আত্মমর্যাদাবোধ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল এমন কোনো তথ্যাদি নেই। ব্রিটিশের অনুগত ভৃত্য হতে নেহরুর কোনো আপত্তি ছিল, এমন কোনো অকাট্য প্রমাণও পাবলিক ডোমেইনে নেই। বরং নেহরুর বাকি আচরণ থেকে আন্দাজ করা যায় যে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর পরিচয় বহন করে গৌরবান্বিত বোধ করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এমন সময়কালটি অতিক্রান্ত হওয়ামাত্র আমেরিকার কাছ থেকে প্রথমবারের জন্য নেহরুর কাছে আসে ইউএনএসসি'র স্থায়ী সদস্যপদের অফার। কিন্তু মনে মনে নেহরু কি তখনও ব্রিটিশ রাজকর্মচারীই রয়ে গিয়েছিলেন? ভারতবর্ষ যখন পূর্ণ স্বাধীনতা সদ্য পেয়েছে মাত্র, তখন ব্রিটিশ-অনুগত রাজকর্মচারী হিসেবে (মনে মনে) রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য আমেরিকার প্রস্তাব ব্রিটেনের গোপন নির্দেশে ফিরিয়ে দিয়ে চীনের কমিউনিস্ট সরকারকে বিশ্বরাজনীতির মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য

তদ্বির করা নেহরুর পক্ষে সম্ভবপর কাজ বলে প্রতীত হয়। ব্রিটেনের পক্ষেও এ কাজে নেহরুকে উদ্বুদ্ধ করা বা গোপন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব ছিল, কারণ কমিউনিস্ট চীন ব্রিটেনের জন্যও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে এমন আশঙ্কা ব্রিটেনের ছিল না। বরং ভারতকে তার সনাতন ভাবধারা থেকে বিচ্যুত করতে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি চীনেও কমিউনিজমের হাওয়া বইতে শুরু করলে ভারতেও সে মতবাদের প্রসার দ্রুততর হতে পারবে এমন ভাবনা থেকেই হয়তো কমিউনিস্ট চীনকে মূলধারায় আনতে নেহরুকে ব্যবহার করেছিল ব্রিটেন। নেহরুরও আদর্শগতভাবে তাতে আপত্তি হওয়ার কোনো কারণ ছিল না, কারণ সনাতন ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে তেমন কোনো জ্ঞান বা বিশেষ শ্রদ্ধা নেহরুর ছিল বলে মনে করার পক্ষে তথ্যপ্রমাণাদি নেই অথচ কমিউনিজম, মার্কসিজম, সোশ্যালিজম ইত্যাদি নেহরুর প্রিয় বিষয় এমন তথ্যপ্রমাণ আছে। অতএব চীনের পথ অনুসরণ করে ভারতেও কমিউনিজম ধীরে ধীরে সর্বাত্মকভাবে প্রসারিত হলে নেহরুর তা মনঃপূত হওয়া স্বাভাবিক।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে নেহরুকে দিয়ে চীনের প্রতিষ্ঠার জন্য তদ্বির করানো ব্রিটেনের একটি ধূর্ত পরিকল্পনা হতে পারে যে পরিকল্পনা ব্যক্তিগতভাবে নেহরুর কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিল। অর্থাৎ ব্রিটেন-নেহরু win-win deal.

১৯৫০-এ আমেরিকার প্রস্তাবকে নেহরু বলেছিলেন চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খারাপ করার উদ্দেশ্যে ভারতের জন্য একটি মার্কিনি 'টোপ'। এমন ভাবনা নেহরুর মনে ব্রিটেনের পক্ষে প্রোথিত করা অতি সহজ ছিল। এডুইনা মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে নেহরুর সম্পর্ক কি এই কাজকে ব্রিটেনের জন্য সহজতর করে দিয়েছিল? হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের প্রতি ক্ষোভবশত তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে শুধুমাত্র ভারতের সনাতন সমাজকে ভাঙতে চেয়ে ভারতে কমিউনিজমের দ্রুততর প্রসার চেয়েছিল বলেই ব্রিটেন নেহরুকে দিয়ে কমিউনিস্ট চীনের বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠার জন্য লবিং করাচ্ছিল, এমন জল্পনা যেন ঠিক দানা বাঁধছে না। স্বভাব-বণিক ব্রিটিশদের জন্য এমন জল্পনাটুকুই যথেষ্ট নয় বলে মনে হয়। এর পিছনে ব্রিটেনের কোনো গভীরতর অর্থকরী উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব।

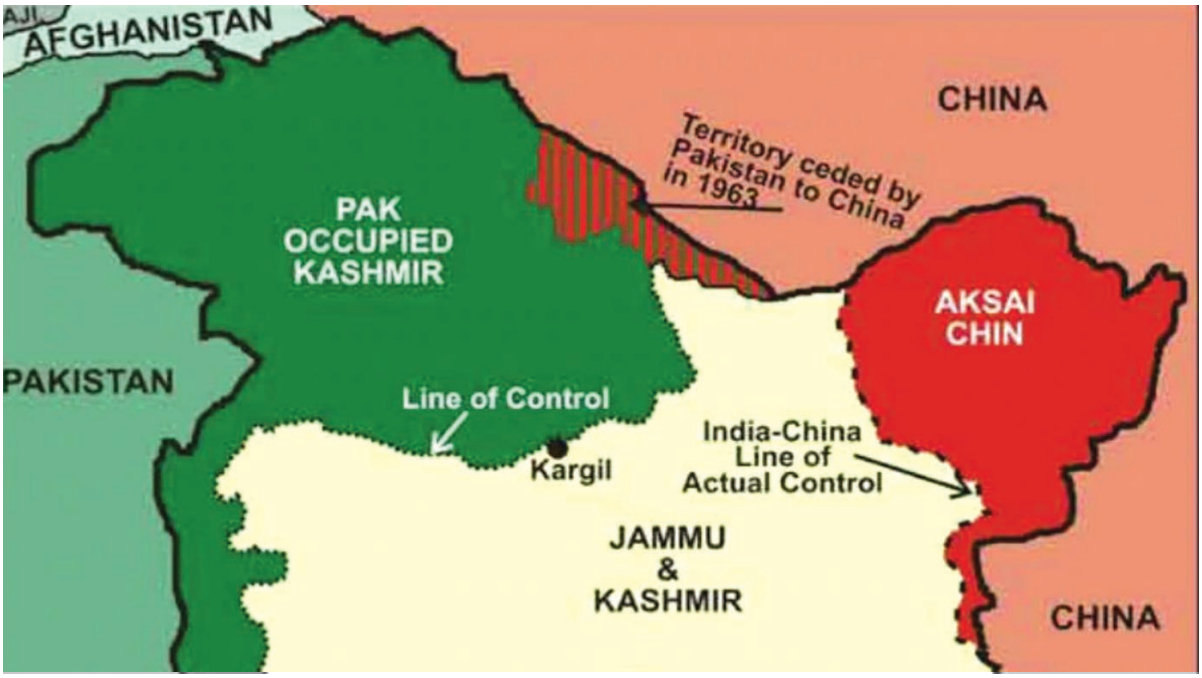

পূর্ণ স্বাধীনতার পরেও নেহরু হয়তো-বা ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের মতোই আর একখানি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে বিশ্বাস করতেই পারেননি। কল্পনাশক্তির সীমাবদ্ধতা জনিত কারণে নিজেকে ভারতের নতুন ব্রিটিশ অনুগত ভাইসরয় পর্যন্ত কল্পনা করতে পেরেছেন, কিন্তু সার্বভৌম ভারতের ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজেকে হয়তো কল্পনাই করতে পারেননি জওহরলাল নেহরু বা কল্পনা করতে চানওনি। ইউএনএসসি-তে ভারত ব্রিটেনের সঙ্গে একাসনে বসবে এমন সত্য বোধহয় তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্যও ছিল না। ব্রিটেন উন্নত দেশ আর ভারতবর্ষ দরিদ্র তৃতীয় বিশ্ব। ব্রিটেন শ্রেষ্ঠতর, শাসক আর ভারতবর্ষ সেদেশের প্রজাউপনিবেশ— এই ধারণাটিকেই স্থাপন করা হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের দুই শতাব্দী যাবৎ আর তার উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়েছিল ব্রিটিশ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা জওহরলাল নেহরুর আত্মগরিমাবোধ। নেহরু জন্মগতভাবে না হলেও শিক্ষাগতভাবে নিজেকে 'ব্রিটিশ' মনে করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করতেন। বাকি ভারতীয় ও নিজের মধ্যে অনুভব করতেন এক পৃথিবী প্রভেদ এবং নিজেকে মনে করতেন অন্য সকল ভারতীয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং 'ব্রিটিশতুল্য'। আশৈশব ব্রিটিশ শিক্ষা তাঁর এইপ্রকার মানসিক গঠনের সম্ভাব্য কারণ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারত ও ব্রিটেনের দুই শতাব্দী লালিত শাসক-শাসিত ভেদাভেদ ঘুচে গিয়ে প্রজা-রাজা এক হয়ে যাবে তা হয়তো মানতে পারেননি নেহরু নিজেই। উপরন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের পদটি অফার করা হয়েছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। ব্যক্তি নেহরুকে নয়। দ্বিতীয়টি হলে, আন্দাজ করা যায়, নেহরু আপত্তি করতেন না, কারণ ব্যক্তি নিজেকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর (যিনিও আদতে আদতে ব্রিটিশ রাজশক্তির ভৃত্যমাত্র)

সমকক্ষ মনে করতে নেহরু আগ্রহী হতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয়ে না বসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একাসনে বসার স্বতঃস্ফূর্ত অর্থ হতো ভারতের সাধারণ জনগণ ও ব্রিটিশ সাধারণ জনগণেরও পরস্পরের সমকক্ষ হওয়া। এটি মানতে হয়তো রাজিই ছিলেন না জওহরলাল নেহরু। যে কোনো সাধারণ ব্রিটিশ তাঁর দৃষ্টিতে যে কোনো সাধারণ ভারতীয়ের চেয়ে উৎকৃষ্টতর মানুষ— এমনই হয়তো বিশ্বাস করতেন তিনি। এহেন নেহরুর পক্ষে ব্রিটেনের গোপন নির্দেশে চীনের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির ক্যাম্পেইন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু প্রশ্ন— কমিউনিস্ট চীনের প্রতিষ্ঠা চাইবার পিছনে ব্রিটেনের সম্ভাব্য প্রকৃত স্বার্থটি কী ছিল?

দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষ ভাগে চলে এসেছি। ব্রিটেনের দেশজ সত্তাটি বণিকের। 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে' —লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজ দেশে সম্পদের অভাব থাকার কারণে অপরাপর দেশ থেকে বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ করাই চিরকাল ব্রিটেনের বৃত্তি হয়ে এসেছে। চীন সরাসরি ব্রিটেনের উপনিবেশ না হলেও চীনের সুবিশাল বাজারটিতেও বাণিজ্য করত ব্রিটেন। চীনের উৎকৃষ্ট চা এবং চীনে উৎপাদিত অন্যান্য নানা জিনিসপত্রের চাহিদা পাশ্চাত্যের বাজারে ছিল অত্যধিক। অন্যদিকে চীনের সাধারণ মানুষের ছিল প্রবল আফিম-আসক্তি। বণিকস্বভাব ব্রিটিশরা ভারতের অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশে আফিমের চাষ করে সেই আফিম চীনকে বিক্রি করে অর্জন করত মোটা মুনাফা। বস্তুত আফিমের ব্যবসা ছিল চীনের বাজারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম প্রধান ব্যবসা।

ওদিকে চিয়াং কাই শেকের নেতৃত্বে চীনের ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্ট ১৯৩৫ সাল নাগাদ চীনের মানুষের আফিমের নেশার ওপর রাশ টেনে ধরতে চায় অর্থাৎ চীনের মানুষকে নেশামুক্ত করতে চায়। অথচ আফিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পাওয়া বিপুল পরিমাণ করের টাকার প্রয়োজনীয়তাটিও তারা অস্বীকার করতে পারে না। তখন মধ্যপন্থা হিসেবে চীনের বাজারে আফিমের ব্যবসা সম্পূর্ণ বন্ধ না করে কেবলমাত্র বিদেশি বণিকদের আফিমের ব্যবসার অনুমোদনটি কেড়ে নেয় ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্ট। সেই সঙ্গে চীনের মানুষের নেশাসক্তিও কমিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেয়। আফিম সেবন কমে আসতে থাকে চীনে, কিন্তু বাজার সংকুচিত হয়ে আসার কারণে বিদেশি বণিকদের মধ্যে দেখা দেয় প্রবল ক্ষোভ। সব বিদেশি বণিকের মধ্যে এই ব্যবসার বৃহত্তম অংশ ছিল ব্রিটেনের এবং এই ব্যবসায় কোনো ভূমিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না। চীনের ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্টের কারণে প্রচুর মুনাফার সেই আফিমের বাজার ব্রিটেনের হাতছাড়া হওয়ায় রাগে ফুসতে থাকে ব্রিটেন।

চীনে ইতিমধ্যে গড়ে ওঠে কমিউনিস্ট আন্দোলন। শাসকের রেজিম পরিবর্তন এবং মানুষের মন পরিবর্তনের জন্য কমিউনিস্ট আন্দোলন এক মোক্ষম অস্ত্র, ব্রিটেন তা উপলব্ধি করেছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। ভারতের কমিউনিস্টদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের হয়েছিল যাকে বলে এক win-win deal. অনুরূপভাবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন নতুন চীন সরকারকে নিরঙ্কুশ বৈশ্বিক স্বীকৃতি পাইয়ে দিয়ে চীনের হারানো আফিমের বাজার কমিউনিস্টদের সাহায্যে হয়তো ফিরে পেতে চেয়েছিল ব্রিটেন। এ কাজ প্রত্যক্ষভাবে করা ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ রাষ্ট্রপুঞ্জের বাকি সদস্য দেশগুলির কাছে ব্রিটেনের স্বরূপ তাতে উন্মোচিত হতো যা ব্রিটেনের পক্ষে সম্মানজনক হতো না। ঠিক এমন সময়েই জওহরলাল নেহরু ছিলেন ব্রিটেনের হাতে এক অসামান্য বোড়ে, যাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসায়িক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে চেয়েছিল ব্রিটেন। ভারত থেকে উপনিবেশ তুলে নিতে বাধ্য হওয়ার পর সম্পদ আহরণের জন্য চীনের আফিমের বাজারের দখল আরও বেশি করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ব্রিটেনের এবং চীনের কমিউনিস্টদের কাছ থেকে তা ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা ব্রিটেন করেছিল। অর পক্ষে, বিশ্বাসভাজন হয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেই নেহরু কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন এবং ব্রিটেনের পরামর্শ তথা গোপন নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এমন একজন অনুরাগভাজন বিশ্বস্তকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ভুল করার কোনো কারণ ব্রিটেনের ছিল না।

ইতিহাস সাক্ষী, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটেনের আশা পূরণ করেনি, কারণ ক্ষমতা দখল করার পর কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট চিয়াং কাইশেকের পথে চীনের মানুষের আফিম-আসক্তি কমানোর প্রয়াসই চালিয়ে যায়। অর্থাৎ ব্রিটেনের উদ্দেশ্য সফল হয়নি, কিন্তু নেহরুর চীন-আসক্তি তার ফলে কোনোদিন কমেনি। কমিউনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি দিতে ব্রিটেনের আদত স্বার্থ যা ছিল আর চীনকে স্বীকৃতি পাইয়ে দিতে পারলে তার প্রভাব ভারতের ক্ষেত্রে যা হতে পারে বলে বুঝিয়েছিল নেহরুকে, সেই দুই তত্ত্ব হয়তো এক ছিল না। নেহরুকে ব্রিটেন স্বপ্ন দেখিয়েছিল যে চীনের পথে ভারতেও একদিন আসবে কমিউনিস্ট রেজিম। সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে নেহরু চিরকাল করে গিয়েছেন চীনবন্দনা। এমনকী ১৯৬২-এর ইন্দোচীন যুদ্ধে ভারতকে বিশ্রীভাবে হারানোর পরেও ১৯৬৩-তে রাষ্ট্রপুঞ্জে এক বিশেষ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করতে গিয়ে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেন— 'I do not understand that why a world-class organization such as the United Nations has not included a big and powerful country like China.' ১৯৬৪-তে মারা যান জওহরলাল নেহরু। অর্থাৎ কোনো কারণেই চীন বিরোধিতা করতে রাজি ছিল না নেহরুর ভারত। এমনকী যুদ্ধ করে ভারতের সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চল চীন দখল করে ফেলবার পরেও নয়। এমন নিরালম্ব চীন-আসক্তিকে অন্য কোনো ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কি না আমার জানা নেই।

অনেক বলেন চীনের হয়ে তদ্বির করে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্বার্থ ত্যাগ করার মাধ্যমে নেহরু নাকি চেয়েছিলেন বিশ্বশান্তির পথ প্রদর্শন করতে এবং সেই সূত্রে নিজের জন্য নাকি চেয়েছিলেন নোবেল শান্তি পুরস্কারটি। এ-ও শোনা যায় যে, সে পুরস্কার জোগাড় করার জন্যও অতি সক্রিয় প্রয়াস করেছিলেন নেহরু নিজেই। কিন্তু নোবেল পুরস্কারের প্রতি লোভই যদি নেহরুর চীন-তোষণের আদত কারণ হতো, তবে নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বকালের মাত্র ৬ বছরের মধ্যে ভারতের পিপিপি জিডিপি চতুর্থ থেকে অষ্টম স্থানে নেমে আসার হিসাবটি মেলানো যায় না। নেহরুর সম্মতিতে ভারতের সম্পদ স্বাধীনতার পরেও ব্রিটেনের সিন্দুকে প্রবেশ করেছে কিনা এবং জিডিপি র‍্যাঙ্কিং-এ ভারতের পতনের পিছনে আদত কারণ সেটিই কিনা, অতিরিক্ত ব্রিটিশ প্রীতির কারণে ব্রিটেনের অঙ্গুলিহেলনেই নেহরুকে চিরকাল চলতে হয়েছে কিনা, সেসব প্রশ্ন রয়েই যায়। (শেষ)

খড়্গপুর আইআইটির চৌকাঠে পা ফেরিওয়ালার ছেলের

বিশেষ প্রতিনিধি।। চারজনের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরনোর মতো অবস্থা। দিন আনা দিন খাওয়া সেই পরিবারের ছোটো ছেলে ছোটন কর্মকার জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সাম পাশ করে সাড়া ফেলে দিয়েছে। বাঁকুড়া জেলার শালতোড়ার এক প্রত্যন্ত গ্রাম পাবড়া। সেখানকার বাসিন্দা ছোটন। বাবা কানাই কর্মকার পেশায় একজন ফেরিওয়ালা। গ্রামেগঞ্জে ঘুরেঘুরে মালা, চুড়ি, লাল-নীল ফিতের মতো রকমারি জিনিস ফেরি করে বেড়ান তিনি। তাই দিয়ে কোনোওমতে টেনেটুনে চলে ছোটনদের সংসার। সেই ছাপোষা সংসারের ছোটোছেলে ছোটন কর্মকার। আশৈশব মেধাবী। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা গোড়ার দিকেই কানাই কর্মকারকে ডেকে ছেলের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে বলেছিলেন। গ্রামের সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'এ ছেলের মেধা আছে। সামলে রাখলে পড়াশোনায় ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।'

ছোটনের পড়াশোনায় আগ্রহ ও মেধার পরিচয় শৈশবেই টের পেয়েছিলেন বাবা কানাই কর্মকার। কিন্তু গরিবের সংসারে দুবেলা দুমুঠো জোগাড় করতেই নাভিশ্বাস ওঠে, সেখানে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন দেখা বিলাসিতার জোগাড়। কিন্তু ছোটন ছিল জেদি। তাঁর অদম্য মনের জোরের কাছে হার মেনেছে দারিদ্র্যও। উপরন্তু চেয়েচিন্তে, মাস্টারমশাই-পড়শিদের সহযোগিতায় একটার পর একটা বাধা অতিক্রম করেছেন ছোটন। এমনকী বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে ছোটনও বেরিয়ে পড়েছেন মনোহারি জিনিসপত্র ফেরি করতে। সেই ছেলেই আজ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মেধাতালিকার উপরের দিকে স্থান অর্জন করে ভর্তি হয়েছে খড়্গপুর আইআইটিতে। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা ছোটনের সাফল্যে গর্বিত তাঁর গ্রামের

লোকজনও।

ছোটনদের বাড়িতে আজও কাঠকয়লার উনুনে রান্না হয়। বাড়িতে গ্যাস ওভেন কেনার সামর্থ্য হয়ে ওঠেনি এখনও। ছোটনের মা বিবিতা দেবী জানেন না খড়্গপুর আইআইটি কী? সেখানে কি পড়াশোনা হয়? শুধু জানেন পরিবারের ছোটো ছেলেটা স্বপ্ন পূরণের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করেছিল, তার ফল পেয়েছে সে। গ্রামবাসীরা বলেছেন ছোটন তাদের গ্রামের গর্ব। বিবিতা দেবী বলেন,'নুন আনতে পান্তা ফুরোয় আমাদের। সেই অবস্থায় ছেলের এই সাফল্য আমাদের নতুন করে লড়াই করার আশা জুগিয়েছে।"

পড়াশোনায় তাঁর আগ্রহ দেখে শত কষ্টেও বাধা দেননি ছোটনের বাবা-মা। গ্রামের সরকারি স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করার পর বাঁকুড়া শহরের একটি স্কুলে বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পড়তে ভর্তি হন ছোটন। উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে এসে শুরু হয় অন্য লড়াই। ছোটো থেকে স্বপ্ন ছিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। বাবার সঙ্গে ফেরি করার মাঝে জয়েন্টের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলেছে হাতেনাতে। এক এক করে জেইই মেইন এবং অ্যাডভান্স পরীক্ষায় মেধাতালিকার উপরের দিকে স্থান করে নিয়েছেন। খড়্গপুর আইআইটি'র ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিঙে ভর্তি হয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময় বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আইআইটি বিষয়ে জানতে পারি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলাম। একটাই লক্ষ্য ছিল, আমায় জয়েন্টে পাশ করতেই হবে। এর জন্য আমার স্কুলের শিক্ষকরা খুব সাহায্য করেছেন।'

মেধাতালিকায় নাম ওঠার পর কাউন্সেলিঙের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩৫ হাজার টাকা। সেই টাকা জোগাড় করতে গিয়ে ফাঁপরে পড়েন ছোটনের বাবা। যদিও শেষমেশ গ্রামবাসী এবং শিক্ষকরা একজোট হয়ে এগিয়ে এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় কাউন্সেলিঙের বেড়া টপকে গেছেন ছোটন। কাউন্সেলিঙের পর কর্মকার পরিবার জানতে পারেন ছোটনের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য চার বছরের কোর্সের খরচ ১২ লক্ষ টাকা। রয়েছে আনুষঙ্গিক আরও খরচ। এত বড়ো অঙ্কের টাকা জোগাড় করা যে সম্ভব না তা বিলক্ষণ জানতেন কানাই কর্মকার। তিনি সরকারি সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানতে পেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার ছোটনের উচ্চশিক্ষার জন্য সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মন্ত্রীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কর্মকার পরিবার। কথায় বলে 'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়' তা ছোটন কর্মকারের হার না মানা লড়াইয়ে আবার প্রমাণিত হলো। তাঁর বাবা কানাই কর্মকার বলেন, 'ও ছোট থেকেই বলত, বাবা আমি অনেক পড়াশোনা করব। হাজার অসুবিধা হলেও আমরা বাধা দিইনি কোনওদিন। সবার সাহায্য নিয়ে আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে আমার ছেলে। আমি ওর জন্য গর্বিত।' □

রাজার তিনটি শিক্ষা

বহুদিন আগেকার কথা। সুদূর দক্ষিণ দেশে এক মহা পরাক্রমী রাজার রাজত্ব ছিল। রাজার তিন পুত্র ছিল। একদিন রাজা মনে মনে ভাবলেন পুত্রদের এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া যাক যাতে তারা তাঁর অবর্তমানে রাজকার্য সামাল দিতে পারে। এই ভাবনায় রাজা একদিন সব পুত্রকে রাজদরবারে ডেকে বললেন, আমাদের রাজ্যে শুধুমাত্র নাশপাতি ফলের গাছ নেই। তোমরা চারমাস পর পর এক-একজন করে সারা রাজ্য খোঁজ করে সেই বৃক্ষ সম্পর্কে আমাকে জানাবে।

রাজার আজ্ঞা অনুসারে চারমাস পর পর তিন রাজকুমার নাশপাতি গাছের সন্ধানে গেল এবং যথাসময়ে ফিরেও এল। রাজা আবার একদিন তাদের রাজ দরবারে ডাকলেন এবং বললেন, বলো, তোমরা নাশপাতি গাছ কীরকম দেখলে?। বড় রাজকুমার বলল, বাবা, নাশপাতি গাছ তো বাঁকা টেরা আর একেবারে শুকনো। গাছে একটিও পাতা নেই।

— না না, তাজা পাতায় ভর্তি গাছ। কিন্তু তাতে একটিও ফল ছিল না। মেজ রাজকুমার বড় রাজকুারের কথার মাঝখানেই বলে ফেলল। ছোটো রাজকুমার মেজ রাজকুমারকে বলল, দাদা তুমিও কোনো ভুল গাছ দেখেছ। আমি সত্য সত্যই নাশপাতি গাছ দেখেছি। আর সারা গাছ ফলে ফলে ভর্তি।

তিন রাজপুত্র নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে লাগল। রাজা তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, পুত্র, তোমাদের নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক করার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা তিনজনে নাশপাতিরই গাছ দেখে এসেছ আর ঠিকমতোই বর্ণনা করেছ। আমি জেনে বুঝেই আলাদা আলাদা ঋতুতে তোমাদের নাশপাতি গাছ খুঁজতে পাঠিয়েছিলাম। তোমরা ঋতু অনুসারে ভিন ভিন্ন সময়ে ঠিকই গাছ দেখে এসেছ। তোমাদের ওই অনুভবের ভিত্তিতে তোমরা তিনটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

প্রথম শিক্ষা হলো, কোনো বিষয়ের সঠিক ও সম্পূর্ণ অভিজ্ঞাতার জন্য দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তা পর্যালোচনা করতে হবে। সেটা কোনো বস্তু হোক, কোনো বিষয় হোক বা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে হোক।

দ্বিতীয় শিক্ষা হলো, কোনো ঋতুই এক রকম হয় না। যে রকম গাছপালা ঋতু অনুসারে কখনো পাতাহীন, কখনো ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ থাকে। সেরকম মানুষের জীবনেও উত্থান-পতন থাকে। যদি মানুষকে কখনো খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তাহলে ধৈর্য হারানো চলবে না আর সময় অবশ্যই বদল হবে।

তৃতীয় কথা হলো, নিজের কথাকেই ঠিক মনে করে জিদ ধরে থাকবে না। অন্যের কথাকেও মান্যতা দিতে হবে। কেউ চাইলেও একা একা সমস্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। তাই যখন কোনো কিছু গোলমেলে মনে হবে তখন বুদ্ধিমান মানুষের পরামর্শ নিতে হবে। তাহলেই জীবনে সফলতা আসবে।

(সংগৃহীত)

ভারতের বিপ্লবী

হরিগোপাল বল (টেগরা)

বিপ্লবী হরিগোপাল বল ওরফে টেগরা চট্টগ্রামের ধোরালায় জন্মগ্রহণ করেন। বাঘের মতো জেদি ছিলেন। তাঁর টাইগার নাম ধীরে ধীরে টেগরা হয়ে যায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী বিপ্লবী। ১৯৩০ সালে বিপ্লবী দলের সদস্য রূপে মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানে যুক্ত ছিলেন। জালালাবাদ পাহাড়ে আত্মগোপনকালে চারদিন পর ব্রিটিশ সৈন্য তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে তাঁরা সম্মুখ সমরে ব্রিটিশ সৈন্যদের পর্যুদস্ত করেন। এই যুদ্ধে তিনি এবং আরও ন'জন জীবন বিসর্জন দেন। মৃত্যুর সময় আনুমানিক তাঁর বয়স ১৩ বছর ছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানের অন্যতম বীর বিপ্লবী লোকনাথ বল তাঁর অগ্রজ ছিলেন।

জানো কি?

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতের প্রথন মহিলা ঔপন্যাসিক।
- রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের কথা 'জীবনস্মৃতি'-তে লিখেছেন।
- তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র গ্রন্থটির নাম ' বিশ্বপরিচয়'।
- বিশ্বপরিচয় তিনি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করেন।
- তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের নাম ' Song of offerings।'
- Song of offerings- এর ভূমিকা লিখেছেন W B Yeats.
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২ বার বিশ্ব ভ্রমণ করেন।।

ভালো কথা

আমাদের ভুলু

আমাদের ভুলু খুব ভালো। ক'দিন আগে আমার একটা বুনু হয়েছে। ভুলু সারাদিন বুনুকে পাহারা দেয়। বুনু মায়ের কোলে থাকলে ভুলু মায়ের পায়ের কাছে বসে থাকে। আমি বুনুর মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেই ভুলু আমার দিকে তাকিয়ে গলায় গরর্ আওয়াজ করে। ভুলু আমাকেও খুব ভালোবাসে। মা বলে ছোটোবেলায় ভুলু আমাকেও পাহারা দিত। মামাবাড়ির সবাইকে ভুলু চেনে। মামারা এলে ভুলু আনন্দে লেজ নাড়াতে থাকে। ভুলুকে আমাদের পাড়ারও সবাই ভালোবাসে।

স্নেহাংশু কর্মকার, অষ্টম শ্রেণী, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ঘরের কথা

দেবারতি সান্যাল, সপ্তম শ্রেণী, নিমতা, কলকাতা-৪৯

ভোরবেলা দাদু করে চা চা
কাক ডাকে কা কা,
মা বলে চায়ের কৌটো ফাঁকা
বাবা বলে পকেটে নাই টাকা।
দিদুন বলে পান পান
যেন ধরেছে কোনো গান
পিসি বলে পান তোমার বন্ধ
এবার বন্ধ হোক মুখে জর্দার গন্ধ।

কাকাই শুধু খেলা খেলা
খেলার মধ্যে ফুটবল
বছর দুই খেলছে কাকাই
করতে পারেনি একটিও গোল।
মায়ের শুধু রান্নাবাড়া
বাপের বাড়ির নেইকো তাড়া
আমার মায়ের সবই ভালো
করে থাকে বাড়ি আলো।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

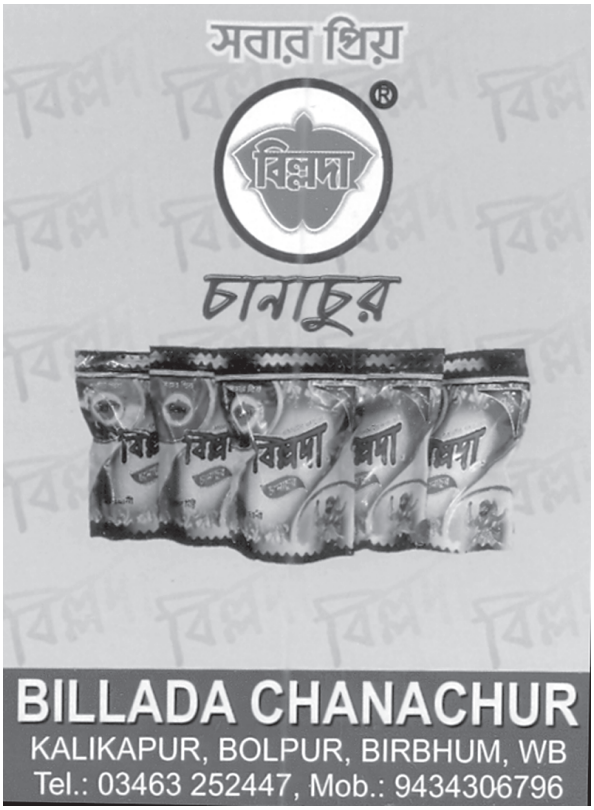

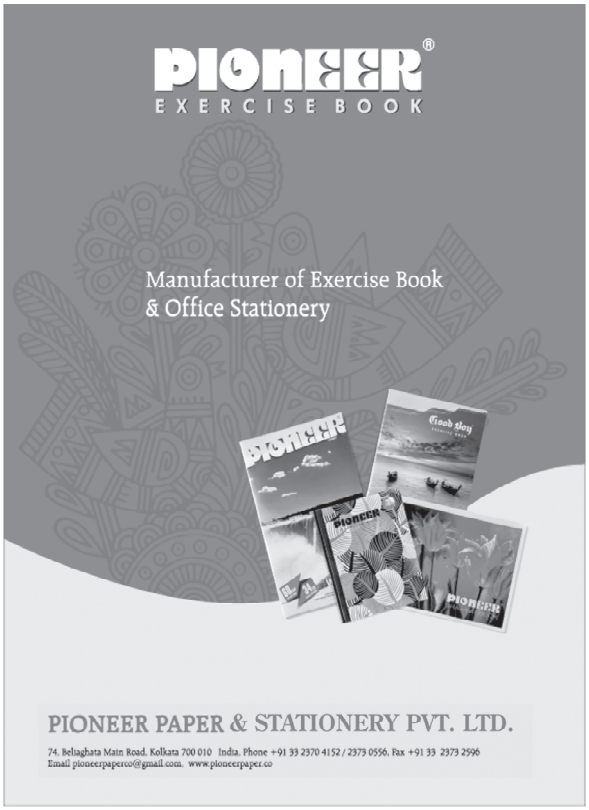

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

মিসিং লিংক

শ্রীরামচন্দ্রের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ অমূলক

রামায়ণের দেওয়ালচিত্র।

সন্দীপ চক্রবর্তী

রোমিলা থাপার থেকে শুরু করে ইরফান হাবিব সকলেই বলেছেন যে, শ্রীরাম বাল্মীকির কাল্পনিক চরিত্র। শ্রীরাম মোটেই ঐতিহাসিক পুরুষ নন এবং রামায়ণও ইতিহাস নয়। এদের ও আরও অভিমত বামপন্থী ঐতিহাসিকের রামায়ণের সত্যতা নিয়ে এমন তীব্র অনীহার অন্যতম প্রধান কারণ রামায়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কর্ণধার অধ্যাপক বি বি লালের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন।

বাবরি মসজিদ প্রেমিসেসের মধ্যে রামজন্মস্থান মন্দিরের উৎস খুঁজতে যে খননকাজ করা হয়েছিল অধ্যাপক লাল ছিলেন সেই দলের প্রধান। রামায়ণের পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ খোঁজার জন্য তিনি অযোধ্যা ও তার আশেপাশের কয়েকটি জায়গায় যেমন শৃঙ্গবেঙ্গপুর, ঋষি ভরদ্বাজ আশ্রম ও পঞ্চবটীতে খননকাজ পরিচালনা করেছিলেন। অধ্যাপক লাল তাঁর গ্রন্থ Rama: His Historicity, Mandir and Setu- তে জানিয়েছেন, অযোধ্যার খননে যেসব মাটির বাসনপত্র পাওয়া গেছে তা Northern Black Polished Ware Culture- এর (C.800-200 B.C.E) অন্তর্ভুক্ত। কিছু বাসনপত্রে কালোর মধ্যে লালরঙের অস্তিত্ব প্রোটো নর্দার্ন ব্ল্যাক কালচার-কে (C.1200-800 B.C.EV চিহ্নিত করে। অর্থাৎ অযোধ্যায় প্রাচীনতম লোকবসতির সময় ১২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। এই হিসেবে অধ্যাপক লাল লিখেছেন, রাম সম্ভবত ১২০০- ১০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়ে অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বলাবাহুল্য, এই সাল, তারিখ মানতে অনেকেই নারাজ। কেউ কেউ দাবি করেছেন,

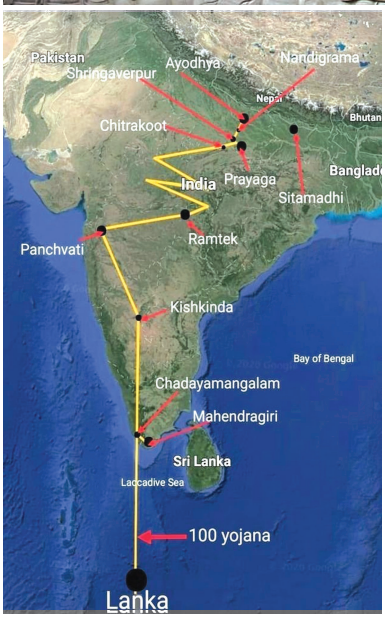

রামায়ণ বর্ণিত স্থান (সৌ : নীলেশ ওক)

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ শুধুমাত্র পুরাতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। সম্প্রতি জেনেটিক সায়েন্স, ওশিয়ানোগ্রাফি, জিয়োলজি ও সিসমোলজির মাধ্যমেও অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। জেনেটিক সায়েন্সের একটি সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, গত ১৫ হাজার বছরে ভারতের সভ্যতা বিশেষ করে সংস্কৃতি কোথাও কোনওভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। এখনকার মতো সেই প্রাচীনকালেও ভারত ছিল সারা বিশ্বে সব থেকে জনবহুল দেশ। এখানে লোক এক জায়গায় বসতি গড়ে তোলার পর কাছাকাছি আরও ভালো জায়গার সন্ধান পেলে সেখানে গিয়ে নতুন বসতি গড়ে তুলত। এই ঘটনা বেশি ঘটেছে গঙ্গা-যমুনা অববাহিকা সমতলে এবং দোয়াব অঞ্চলে। পরিত্যক্ত বসতি কালের আবর্তে হারিয়ে যাওয়ার পর কিংবা অনেক সময় তার আগেই অন্য কোনো জনগোষ্ঠী এসে নতুন বসতি স্থাপন করত। ফলে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে অপেক্ষাকৃত নবীন লোকবসতির প্রমাণই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তার মানে এই নয় ১২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের আগে অযোধ্যায় জনবসতি ছিল না। সরোজ বালা ও কুলভূষণ মিশ্র তাঁদের গ্রন্থে (Historicity of Vedic and Ramayana Eras: Scientific Evidences from the Depth of Oceans to the Heights of the Skies) বেশ কিছু নতুন তথ্যের অবতারণা করেছেন। গ্রন্থে যেসব বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের গবেষণার অংশবিশেষ লিপিবদ্ধ হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট ভারতের প্রাচীন রাজবংশগুলির কালপঞ্জী যথেষ্টই নির্ভরযোগ্য। এবং এর ভিত্তিতে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বের যে ধারণা তাঁরা দিয়েছিলেন, তা-ও যুক্তিসংগত।

বস্তুত, গত দেড়শো বছর ধরে ইউরোপ ও আমেরিকার পুরাতাত্ত্বিক ও ভাষাতত্ত্ববিদেরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের যে কালপঞ্জী

নির্ণয় করেছেন তার থেকে গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিস এবং অন্যান্য গ্রিক লেখকদের কালপঞ্জী অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দির ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কিত ভাবনার মূলে ছিল দুটি ধারণা- ১) বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল ৪ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ, ২) তারপর ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুসারে আদিম ও বন্য মানুষ মোটামুটি ৩৪০০ বছর ধরে নানা স্তর পেরিয়ে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ গ্রিসে সব দিক থেকে সভ্য ও শিক্ষিত হয়ে ওঠে। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার কালপঞ্জীও অনেকাংশে এই দুটি ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। এখন দেখা দরকার রামায়ণের কালপঞ্জী নির্ণয় ও রামের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আর কী তথ্য আমাদের হাতে আছে।

১) রামায়ণে গ্রহ-নক্ষত্র ও তিথি সংক্রান্ত সে সব তথ্য (Archeo-Astronomical data) রয়েছে তা আধুনিক সফটওয়্যারে বিশ্লেষণ করে জানা যাচ্ছে রামের জন্ম হয়েছিল ৫,১১৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে (পুনর্বসু নক্ষত্র, চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী)। আবার সূর্যবংশের চৌষট্টিতম রাজা হিসেবে তিনি ৫০৭৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে অযোধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত হন। রামায়ণে মোট ২৫০টি জায়গার কথা বলা হয়েছে। এসব জায়গার নাম সেই রামায়ণের সময় থেকে এখনও পর্যন্ত একই রয়েছে। এমনকী এখানকার আকৃতি, প্রকৃতি ও আবহাওয়ারও কোনও পরিবর্তন হয়নি। রামায়ণ যিনি বা যারা লিখেছেন তিনি বা তাঁরা যে এইসব জায়গা সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল ছিলেন সেটা রামায়ণ পড়লে বোঝা যায়।

২) রামায়ণের কালপঞ্জী নির্ণয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এটি কবে লেখা হয়েছিল? সত্যি কথা বলতে কী, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কারণ রামায়ণের যে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি নেপালে সংরক্ষিত রয়েছে সেটি মাত্র ১০০০ বছরের পুরনো। অধ্যাপক বি বি লালের মতে বাল্মীকি ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনও সময়ের লোক ছিলেন। উল্লেখ্য, পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের নিরিখে তিনি রামের জন্মের কালপঞ্জী নির্ণয় করেছেন ১২০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। অর্থাৎ রামের জন্মের প্রায় ৮০০ বছর পর বাল্মীকির জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এই অনুমান যুক্তিসংগত নয়। কারণ রামায়ণে স্থান বিবরণ, খেত খামার, জনবিন্যাস ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত যে বিপুল তথ্য রয়েছে তাতে স্পষ্ট বাল্মীকি রামের সমসাময়িক ছিলেন। কমপিউটার ও আধুনিক সফটওয়্যারের সাহায্য ব্যতিরেকে ৮০০ বছর পর কোনও ব্যক্তির পক্ষে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কিত নিখুঁত তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়।

রামায়ণ যদি শুধুমাত্র মহাকাব্য হতো বা কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে লেখা হতো তাহলে গ্রহ-নক্ষত্র ও তিথি সংক্রান্ত এমন বিপুল তথ্য সমাবেশ করার কোনও প্রয়োজন হতো না। দেখা যাচ্ছে, রামের বনবাস যাত্রার খুঁটিনাটি ডিটেইলস বাল্মীকি রাখতেন (ঠিক যেমন ভাবে সেই সময় রাজাদের কাজকর্মের রেকর্ড রাখা হতো)। পরে তিনি যখন রামায়ণ রচনায় হাত দেন এইসব ডিটেইল মূল গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। খ্রিস্টাব্দ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই রামায়ণ ও রামের কথা লোকে জানত। আর্যাবর্তের চারণকবিরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরে রামায়ণ গাইতেন। পরে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। পণ্ডিত নারায়ণ আয়েঙ্গার লিখেছেন, 'ঋক্‌বেদের কয়েকটি সূত্রে রাম-সীতার কথা রয়েছে। এই সূত্রে বর্ণিত বিভিন্ন জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সরোজবালা ও কুলভূষণ মিশ্র রামায়ণের কালপঞ্জী ৯০০০-৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে বলে স্থির করেছেন।

৩) এর পাশাপাশি, পুরাতাত্ত্বিক, প্যালিও-বোটানিক্যাল, ওশিয়ানোগ্রাফিক এবং রিমোট সেন্সিং সংক্রান্ত নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদই ভারতের বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে লোকবসতি, উন্নত কৃষি সভ্যতা ও শিল্পসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। শিল্প বলতে ছিল কাঠ, বস্তু, পাথর ও ধাতুর ওপর আঁকা সুন্দর ছবি ও মোটিফ। সম্ভবত শেষ হিমযুগ হ্যালোসিনের (১০,০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) পরেই ভারতে কৃষিকাজের গোড়াপত্তন হয়েছিল, যা পরবর্তীতে জনবিন্যাসের পরিবর্তন ও এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সূচনা করে। এই সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল আজকের সিন্ধু-সরস্বতী-গঙ্গা-যমুনা নদী অববাহিকা জুড়ে। মূল কেন্দ্র ছিল মেহেরগড়, কোটদিজি, নওশেরা, ধোলাভিরা, লাহুরাদেবা, ঝুসি, টাকওয়া, হাট্টাপটি।

৪) একটা জিনিস পরিষ্কার, ইউরোপের পণ্ডিতেরা রামায়ণের যে কালপঞ্জী তৈরি করেছেন তার থেকে অনেক বেশি স্পষ্ট ও যুক্তি সংগত কালপঞ্জী রামায়ণেই রয়েছে। বিশেষ করে রামের জন্ম, বনবাস, কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালীর মৃত্যু, রাবণের মৃত্যু এবং রামের অযোধ্যায় ফেরার ঘটনাগুলি যে সময়ে ঘটেছিল তার নিখুঁত আর্কিও-অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডেটা দিয়েছেন বাল্মীকি। এসব ঘটনার কালপঞ্জী নির্ণয়ে ভাষাতত্ত্বের সাহায্য নেবার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ ভাষাতত্ত্ব যা বলে তা বেশিরভাগ সময়েই সর্বজনগ্রাহ্য হয় না।

৫) রামায়ণে আর্কিও-অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার একটা উদাহরণ দিয়ে এই লেখা শেষ করব। রামায়ণে ঋষি অগস্ত্যর কথা আছে। তিনি বর্তমান নাসিকের কাছে থাকতেন। রাম যখন চিত্রকূটের দিকে যাচ্ছিলেন তখন অগস্ত্যর সঙ্গে দেখা করে যান। অগস্ত্য তাঁকে বেশ কিছু উপদেশ দেন। এই অগস্ত্য হচ্ছেন সেই মানুষ যিনি প্রথম ক্যানোপাস নক্ষত্র দেখেছিলেন। ক্যানোপাসের বাংলা মেরুনক্ষত্র হতে পারে। এই নক্ষত্র একমাত্র বিন্ধ্যপর্বত ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশ থেকে দেখা যেত। কিন্তু কোন সময়ে দেখা যেত সেটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যেত ৫,১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। অর্থাৎ এখান থেকে আমরা রামায়ণের কালপঞ্জীর একটি দিকনির্দেশ পাচ্ছি।

এমন একটি দুরূহ বিষয় নিয়ে মাত্র একটি নিবন্ধে সবকথা বলা সম্ভব নয়। পরের বার আমরা প্যালিও-ক্লাইমেট ও ওশিয়ানোগ্রাফির কিছু তথ্য নিয়ে আলোচনা করব। এইসব তথ্য নিঃসন্দেহে রামের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করবে। আসলে, কোনো ঘটনার কালপঞ্জী পাওয়া গেলে সেটা আর কাল্পনিক থাকে না। ঘটনার চরিত্রগুলিও বাস্তবের চরিত্র হয়ে ওঠে। এই সিরিজের মুখ্য উদ্দেশ্য সেটাই।

কেশবরাও দীক্ষিত ছিলেন মানুষ গড়ার আদর্শ কারিগর

বিধান হালদার

২০১২ সালের ২১ আগস্ট রবিবার সকালে কেশব ভবনের শাখায় কেশবজীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। শাখা শেষে কেশবজী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? কোথায় বাড়ি? কী করো?

সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবো তখনই বললেন, উপরে চলে যাও, জলযোগ করে নেবে। জিজ্ঞেস করলাম আপনি যাবেন না? বললেন, তুমি যাও আমি একটু পরেই যাবো (কেশবজী নীচে রাখা সমস্ত খবরের কাগজ পড়েই উপরে উঠেন)। ঠিক আছে, বলে উপরে চলে গেলাম।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে স্নাতকোত্তর পড়ার জন্য গ্রাম থেকে কলকাতায় এলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং হোস্টেলে বেড পাওয়ার মধ্যে কয়েকদিন দেরি হয়। ক্লাসও শুরু হয়ে যায়। অগত্যা একটাই ঠিকানা ছিল সঙ্ঘের কার্যালয়। কেশব ভবনে এসেছিলাম প্রায় চার মাস আগে বিএইচইউ-তে স্নাতকোত্তর পড়ার এন্ট্রান্স এক্সাম দিতে। তখন কার্যালয় প্রমুখ ছিলেন সুকেশদা। পরীক্ষার সেন্টার ছিল বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে, তাই তিনি সব শুনে নেতাজী ভবন মেট্রোর পাশে ৮৪নং কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ভেবেছিলাম এখন যাই, পরে কিছু একটা ব্যবস্থা হয়তো হয়ে যাবে। কিন্তু তখন আর কোথাও যেতে হলো না, কেশব ভবনের অতিথি কক্ষেই থাকার ব্যবস্থা হলো। সকালে উঠে প্রাতঃস্মরণের পর শাখা করে জলযোগ, তারপর ইউনিভার্সিটি যেতাম। একদিন শাখায় যেতে পারিনি, ইউনিভার্সিটি যাওয়ার সময় দেখি কেশবজী পেপার পড়ছিলেন। পেপারের দিকে চোখ রেখেই প্রশ্ন ছুটে এলো, আজকে কেন শাখায় যাওনি? ভয়ে ভয়ে বললাম শরীরটা ঠিক লাগছিল না, কাল যাব। আসল কথা সকালে ওঠা অভ্যেস ছিল না তাই উঠতে পারিনি। তার পর থেকে নিয়মিত শাখায় যেতাম।

ক'দিন পর বউবাজারে একটা হোস্টেল পেয়ে চলে এলাম। পুজোর পর বিজয়ার প্রণাম করতে গিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। ছোটো ছোটো বিষয় জানতে চাইলেন এত বড়ো একজন কার্যকর্তা। ভালো লেগে গেল মানুষটির প্রতি। আমার সব খবর নিলেন। প্রত্নতত্ত্বের উপর অনেকক্ষণ কথা হলো। এরপর থেকেই আমি মাঝে মধ্যেই চলে যেতাম কেশব ভবনে তাঁর খবর নিতে, গল্প করতে। একদিন আমার কলকাতায় পড়াশোনার খরচের বিষয়ে খোঁজ নিলেন। পরেরবার দেখা করে ফেরার সময় আমাকে ডেকে একটা ৫০০ টাকার চেক দিয়ে বললেন, এটা তুলে নাও। তখন আমি কী বলবো বুঝে উঠতে পারিছিলাম না। বললেন তুমি টিউশন পড়িয়ে যা ইনকাম করছো করো, আমি ৫০০ টাকা করে দেবো প্রতিমাসে। তার বেশি দিতে পারবো না। বললাম আমি তো কিছুই চাইনি আপনার কাছে। —'আমার কাছে কিছুই নেই, ভাই যা পাঠায় সেটাই আছে, সেখান থেকেই সবাইকে দিই যার যখন লাগে। আমার মনে হলো তোমাকে দিই তাই দিচ্ছি, যতক্ষণ থাকবে দেবো, আর আমি টাকা রেখে কী করবো।' তখন হোস্টেলে খাওয়া খরচ নিয়ে আমার মাসে খরচ হতো প্রায় ১৫০০ টাকা মতো।

'আমি যেদিন চাকরি পাবো সব টাকা ফেরত দিয়ে

দেবো', উত্তরে মজা করে বললেন 'ততদিনে আমি উপরে চলে যাবো। আর যদি বেঁচে থাকি তো সব হিসেব করে নিয়ে নেবো। আর তুমি যে বিষয় পড়ছো তাতে তোমাকে পশ্চিমবঙ্গে কে চাকরি দেবে?' আমিও বললাম চাকরি তো আমি একদিন করবোই আর সেটা বড়োসড়ো চাকরিই করবো, আর আপনি ততদিন বেঁচে থাকবেন আমার চাকরি দেখার জন্য।'

কয়েক মাস পরে একদিন বললেন, 'এইরকম ৫০০ টাকা করে দিতে ভালো লাগছে না, তুমি একেবারে ১০ মাসের ৫০০০ টাকা নিয়ে যাও। শেষ হলে বলবে।' শুধু তিনি নিজে নয়, আমার স্নাতকোত্তর পড়া চলাকালীন মহুয়াদির এবং সিঁথির মোড়ের কাছে হাইকোর্টের একজন উকিলের কাছে পাঠালেন, বই কেনার কিছু টাকার জন্য। আমাকে একবার ফোন করে পাননি, পরেরবার দেখা করতে গিয়ে বকুনি খেলাম। বললাম ফোন খারাপ হয়ে গেছিল। আমাকে একটা ফোন দিলেন, ব্যবহার করার জন্য।

২০১৩ সালে আগস্ট মাসে আমার মাইগ্রেনের সমস্যা দেখা দিল, কেশবজীকে বলতেই তিনি আমাকে আয়ুর্বেদিক হসপিটালে যেতে বললেন। 'ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন আমাকে দেখিয়ে যাবে, তারপর ওষুধ কিনবে।' তাই করলাম, আমাকে ১৪০০ টাকার চেক ধরিয়ে বললেন নীচে ব্যাংক থেকে তুলে নাও। লাগলে আবার এসো। একদিন তিনি ডাক্তার দেখাতে যাবেন তখন আমি হাজির, বললেন এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই আমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে চলো, নিয়ে গেলেন নাগের বাজারে এক চোখের ডাক্তারের কাছে। আমাকেও দেখিয়ে দিলেন, ডাক্তারবাবু আমাকে পাওয়ার চেঞ্জ করতে বললেন। চশমাও কিনে দিলেন সেখান থেকেই।

২০১৪ সালের জুলাই মাসে আমার স্নাতকোত্তরের পড়াশোনা শেষ হয়ে গেল। কেশবজী বললেন, হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে কেশব ভবনে আমার পাশের বেডে থাকবে আর পড়াশোনা করবে। নতুন ছাত্র আসার আগেই আমি এমফিল-এ ভর্তি হয়ে যাই এবং হোস্টেলও পেয়ে যাই। তাই আর কেশবজীর সঙ্গে থাকা হয়নি। ২০১৪-র জুনে স্নাতকোত্তর পাশ করার আগেই ইউজিসি নেট পরীক্ষায় পাশ করি। ডিসেম্বর মাসে আরজিএনএফ ফেলোশিপ পাই। ২০১৫ সালের মে মাসে বেহালার রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালায় ৯ মাসের চুক্তি ভিত্তিক একটা চাকরি পাই, মাসে ৯০০০ টাকা। তারপর আর কেশবজীর থেকে টাকা নিতে হয়নি।

২০১৫ সালের জুন মাসে ইউজিসি জেআরএফ ফেলোশিপ পেয়ে প্রতি মাসে গবেষণার জন্য বত্রিশ হাজার টাকা পাবো শুনেই কেশবজী প্রথমেই বললেন টাকা পেয়ে আগে বাড়িতে জানাবে, বাবা-মায়ের পরিশ্রমেই আজকে তুমি সফল হয়েছো। আমি তোমাকে একটু সাহায্য করেছি মাত্র।

২০১৫ সালের ৩০ আগস্ট আমার খুব জ্বর হয়। এর আগে এরকম কোনোদিন হয়নি। অসহ্য গা-হাত-পা ব্যথা। মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তার দেখিয়েও কমছে না। তখন আর কিছু উপায় না পেয়ে কেশবজীকে ফোন করলাম, কোনো ভালো ডাক্তার আছে কিনা? সব জানতে চাইলেন। একজন ৯১ বছর বয়স্ক ব্যক্তির কাছে আমি সাহায্য চাইছি, যেখানে তাঁর নিজের শরীর বিশেষ ভালো নেই। সব শোনার পরে দুজন প্রচারক রঞ্জনদা ও সুশান্তদাকে হোস্টেলে পাঠালেন।

পরেরদিন শরীর আরও খারাপ হয়ে গেল। কেশবজীকে ছাড়া আর কাউকেও পেলাম না বলার মতো, এইটুকু জানি এইরকম খবর পেলেই তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়বেন। উপায় না পেয়েই জানাতে বাধ্য হলাম। কারণ কলকাতাতে আর কেউ নেই যাকে আমি যখন খুশি যা খুশি জানাতে পারি। সুশান্তদা আমার হোস্টেলে এসে হসপিটালে ভর্তি করানোর জন্য আমাকে নিয়ে গেলেন বিশুদ্ধানন্দ মাড়োয়ারি হসপিটালে।

ম্যালেরিয়া ধরা পড়লো, সাতদিন ভর্তি ছিলাম। গ্রাম থেকে আমার বাবা এসেছিলেন। নিয়মিত কোনো না কোনো কার্যকর্তা আসতেন আমাকে দেখতে। একদিন এলেন ক্ষেত্রপ্রচারক অদ্বৈতদা, আমি বুঝতে পারলাম তাঁকে কেশবজী পাঠিয়েছেন। যেদিন ছাড়া পেলাম সেদিন নগর কার্যবাহ চন্দনদাকে দিয়ে ৩০০০ টাকা পাঠালেন হসপিটালের বিল ও ওষুধের দাম মেটানোর জন্য।

২০১৯ সাল আগস্ট মাসে কলেজে চাকরি পেলাম। প্রথমেই বাড়িতে ফোন করে জানালাম। কেশবজীকে ফোন করিনি, যখন খবর পেলাম তখন কলেজ স্ট্রিটেই ছিলাম। সোজা মিষ্টি নিয়ে কেশবজীর কাছে। চাকরি পাওয়ার খবর শুনে তিনি এতো খুশি হলেন যে, আগে কোনোদিন দেখিনি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি প্রায়ই কেশব ভবন যেতাম, বলতে গেলে একদম নিয়মিত। যদিও চাকরি পাওয়ার পর নিয়ম করে যেতে পারিনি। যখন যেতাম দেখা করার জন্য, তখন বলতেন কী ব্যাপার অনেকদিন পরে এলে যে? সব খবর ভালো তো? বাড়িতে বাবা-মা কেমন আছেন? ভাই পড়াশোনা করছে তো?

চাকরি পাওয়ার পর যখন একটু বেশি দিনের ব্যবধানে দেখা করতে গেছি তখনই মজা করে বলেছেন, এখন অধ্যাপক মানুষ, ব্যস্ত মানুষ, এই বুড়োর সঙ্গে আর কী কাজ আছে?

তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক খুব বেশি দিনের নয়, বলতে গেলে তাঁর জীবনকালের শেষ এক দশক মাত্র। বয়সের পার্থক্য প্রায় সাড়ে পঁয়ষট্টি বছর। যখন পরিচয় হয় তখন তাঁর বয়স ৮৭ বছর আর আমার ২১ বছর। এই যে এতগুলো কথা বললাম এগুলো একটা সংখ্যা মাত্র, কারণ বয়েসের পার্থক্য থাকলেও তিনি একজন যুগোপযোগী পুরুষ। যে ব্যক্তির যা বয়স এবং তিনি যে পেশার মানুষ তার সঙ্গে ঠিক সেই ভাবেই, সেই বিষয় নিয়েই চর্চা করতেন। মানুষকে বোঝার এতো ক্ষমতা নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না। কারও চোখ মুখ দেখলেই তিনি যেন সব বুঝে যান। আর সেটা কেনই-বা হবে না, তিনি তো মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন।

২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পড়াশোনার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছি। স্নাতকোত্তর পড়াকালীন পড়াশোনাতে একটু বেশি মনোযোগী ও পরিশ্রম করতে পেরেছিলাম, কারণ তখন অর্থের জন্য আমাকে অন্য কোনো কাজ করতে হয়নি। স্নাতকোত্তর শেষ করার পর অর্থের জন্য কোনো কিছু না ভেবেই পড়াশোনা করতে পেরেছিলাম। কারণ আর্থিক বিষয়ে আমাকে বেশি চিন্তা করতে হয়নি। যতটুকু ঘাটতি ছিল ঠিক ততটুকুই পেয়ে গেছি কেশবজীর কাছে। কেশবজী আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু যতদিন বাঁচবো ততদিন তিনি আমার মনের মধ্যেই থাকবেন। আজ আমি সফল হয়েছি, কারণ আমার মাথায় কেশবজীর হাত ছিল। কেশবজী একজন মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন, সেটা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। □

দুটি জাতীয় গেমসে সেরা মহিলা ক্রীড়াবিদ

চৌদ্দ বছরের হাসিকা রামচন্দ্র

নিলয় সামন্ত

শেষবার ভারতে জাতীয় গেমস হয়েছিল, ২০১৫ সালে। তখন হাসিকা রামচন্দ্র সাঁতার সম্পর্কে খুব বেশি সিরিয়াস ছিলেন না। সেই সময় তিনি এটিকে সময় কাটাতে এবং কিছু ওজন কমাতে সাহায্য করার মতো কিছু বলে মনে করেছিলেন। অবশ্য তখন তাঁর বয়স তখন মাত্র সাত বছর ছিল।

সাম্প্রতিককালে সেই মানসিকতা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। গুজরাটে ৩৬তম জাতীয় গেমসে বেঙ্গালুরুর ১৪ বছর বয়সি রামচন্দ্র সাতটি পদক জিতেছেন—যার মধ্যে ছয়টি সোনা। এজন্য তিনি সেরা মহিলা ক্রীড়াবিদ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ‘খুব ভালো লাগছে। আমি খুব খুশি, এটি একটি খুব বড়ো পুরস্কার, তবে আরও অনেক কাজ বাকি আছে। এটাই আমি এখন আমার মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করছি’, রাজকোর্টের সর্দার প্যাটেল সুইমিং কমপ্লেক্সে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পর হাসিকা এক কথোপকথনে বলেছিলেন।

তিনি ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ২০০ মিটার বাটারফ্লাই, ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে মিট রেকর্ড স্থাপন করেছেন এবং মহিলাদের কর্ণাটক ৪ × ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে দলের হয়েও রেকর্ড তৈরি করেন। ওজন কমাতে এবং উচ্চতা বাড়ানোর জন্য তার মায়ের পীড়াপীড়িতে তিনি চার বছর বয়সে সাঁতার কাটা শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত খেলাটিকে গুরুত্ব দেওয়ার আগে তার কিছুটা সময় লেগেছিল। হাশিকা বেঙ্গালুরুর নগরভবীর সিন্দিয়া সুইমিং স্কুলে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করেন যেখানে কোচ বিক্রম এন খারভি তার প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অনেক ভারতীয় বাবা-মায়ের মতো হাসিকাকে সাঁতারে দিতে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না তাঁর বাবা-মাও। তাই প্রাথমিকভাবে স্থানীয় প্রতিযোগিতায় তাকে অংশ নিতে দিতে চাইতেন না। কিন্তু এসব অগ্রাহ্য করে, খারভি অটল ছিলেন এবং তিনি নিজেই সাঁতার টুর্নামেন্টে হাসিকাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন।

‘যখন তিনি শুরু করেছিলেন, আমি সেখানে নিজেই লক্ষ্য করেছি যে সে তার বয়সী অন্যান্য শিশুদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল’, খারভি তার কথোপকথনে বলেন। তিনি নিজে কখনও হারতে পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের তাদের বয়স নির্বিশেষে একে অপরের বিরুদ্ধে রেস করাতেন। কিন্তু হাসিকাকে বড়ো বাচ্চাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধ্য করান খারভি। হাশিকার মা তাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলে, খারভি তাকে বলতেন যে হাশিকা শক্তিশালী কিন্তু তার অলসতা তাকে আটকে রেখেছে। যখন সে অনূর্ধ্ব আট স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল, তখন সে তার প্রতিযোগীদের থেকে অনেক এগিয়েছিল। তিনি যখন প্রতিযোগিতায় যেতে শুরু করেন এবং রেস জিততে শুরু করেন তখন তিনি সাঁতারে আগ্রহী এবং মনোযোগী হন। সেই সময়েই তার বাবা-মা হাসিকার প্রতিভা বুঝতে পেরেছিলেন।

সিন্ধিয়া অ্যাকাডেমিতে পাঁচ বছর প্রশিক্ষণের পর, পাড়ুকোন- দ্রাবিড় সেন্টার ফর স্পোর্টস এক্সিলেন্সে ডলফিন অ্যাকোয়াটিক্সে যোগ দিয়েছিলেন যাতে সে একটি বড়ো পুলে প্রশিক্ষণ নিতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য এই ব্যবস্থা করেছিলেন খারভি একপ্রকার জেদ করে। তার সাঁতারে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার জন্য হাসিকা ২০১১ সালে অনলাইন-স্কুলিংয়ে নেওয়া শুরু করেন, যা তাকে প্রশিক্ষণের জন্য আরও বেশি সময় দিয়েছে। ডলফিন অ্যাকোয়াটিক্সে সকাল পাঁচটায় প্রশিক্ষণ দিয়ে সাঁতারুদের একটি সাধারণ দিন শুরু হয়। কয়েক ঘণ্টা প্রশিক্ষণের পর, সে সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পঞ্চাশ পর্যন্ত পড়াশোনা করে এবং তারপর সন্ধ্যায় কয়েক ঘণ্টার জন্য ট্রেনিং করেন। ‘এটি খুব কঠিন। একসঙ্গে পড়াশোনার জাগলিং, আবার সাঁতার কাটা। আমি বোর্ডিঙে থাকতাম। যা একটি প্লাস পয়েন্ট। আমার স্কুল আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করে। যদি আমি একটি ক্লাস মিস করি, সেখানে রেকর্ড করা ক্লাস আমাকে করানো হতো। আমি এই বছর হোম-স্কুলিং শুরু করেছি, যাতে আমি সাঁতারে আরও বেশি মনোযোগ দিতে পারি’, হাসিকা বলেন।

যদিও এখনও তার কিশোরী বয়সে হাসিকা নতুন কর্মজীবনে অনেক বেশি বয়স্ক সাঁতারুদের বিরুদ্ধে উঠে এসেছেন এবং সেরা হয়েছেন। কিন্তু তিনি কোনও প্রতিযোগিতাকে ছোটো করে দেখেন না। ‘আমি আমার মাথায় বয়স্ক ক্রীড়াবিদদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চাপ না নেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ দিনের শেষে, তারাও প্রতিযোগী, আপনাকে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে, তাই আপনাকে এটি করতে হবে। আমি তাদের সম্পর্কে খুব বেশি ভাবি না, আমি স্বাভাবিকভাবে প্রতিযোগিতা উপভোগ করি,’ তিনি যোগ করেন। এটি শুধুমাত্র তার রেসের উপর ফোকাস করার সেই সহজ ক্ষমতা, যা হাসিকাকে প্রথম কর্ণাটক ক্রীড়াবিদ হিসেবে ন্যাশনাল গেমসে সেরা ক্রীড়াবিদ পুরস্কার জিততে সাহায্য করে। এর আগের রেকর্ড ছিল নিশা মিলেটের। অদম্য মনোবলে হাসিকা এখন ভারতীয় সাঁতারের একজন সফল ক্রীড়াবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। ◘

পশ্চিমবঙ্গে শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্পে টাকা পড়ে রয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা।। পশ্চিমবঙ্গের শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্পে নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছে কেন্দ্র। অথচ প্রতি বছর সেই বরাদ্দ টাকা খরচ না করে 'আনইউটিলাইজড' বা ফেলে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ তুলেছেন 'রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম' (আরবিএসকে)-এ কর্মরত আয়ুষ মেডিক্যাল অফিসারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।

আয়ুষ অর্থাৎ আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি চিকিৎসকদের সংগঠন 'আয়ুষ মেডিক্যাল অফিসার্স আরবিএসকে অ্যাসোসিয়েশন'-এর অভিযোগ, শিশু স্বাস্থ্য খাতে কেন্দ্র প্রতি বছর যে টাকা পাঠাচ্ছে তা খরচ করছে না মমতা সরকার। চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে জগদ্দলের বাসিন্দা এক আয়ুষ চিকিৎসকের করা আরটিআইয়ের জবাবে সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রকের 'রিপ্রোডাকটিভ অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ' বিভাগের অধিকর্তা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অন্তর্গত আরবিএস প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তরের অর্থব্যয়ের খতিয়ান পাঠিয়েছেন। তাতে দেখা গেছে, ২০১৪-১৫ থেকে ২০২১ পর্যন্ত প্রতি বছরই আরবিএসকে-র মেডিক্যাল অফিসারদের খাতে রাজ্যকে দেওয়া টাকার মধ্যে কয়েকশো কোটি টাকা খরচ করেনি রাজ্য।

প্রসঙ্গত, আরবিএসকে যোজনায় মেডিক্যাল অফিসারদের ৪৫০ শূন্য পদে নিয়োগ, তাদের বেতন বৃদ্ধি ও দুর্ঘটনাজনিত বিমার মতো বহু দাবির প্রতি রাজ্য সরকার দীর্ঘ সময় ধরেই কর্ণপাত করছে না। তবে এই অভিযোগ মানতে নারাজ রাজ্য সরকার।

আয়ুষ মেডিক্যাল অফিসারদের বক্তব্য, তাঁরা মোবাইল ইউনিট ও ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইনভেনশন সেন্টারের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের কাজ হলো স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ঘুরে শিশুদের গঠনগত ত্রুটি, মস্তিষ্কের বিকাশ ও বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিত করে তার রিপোর্ট তৈরি করা। তাঁদের অভিযোগ, রাজ্যে আরবিএসকে-র মেডিক্যাল অফিসারের ১৬৫৬ পদের মধ্যে মাত্র ১২০০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ বন্ধ। বেতন দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৩২ হাজার টাকা।

আরটিআইয়ের জবাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া খতিয়ান

রাষ্ট্রীয় শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্প (পশ্চিমবঙ্গের জন্য অনুমোদিত টাকা ও তার খরচের পরিমাণ)

সাল	অনুমোদন	অব্যবহৃত
২০১৫-১৬	৬৮০ কোটি	২০৮ কোটি
২০১৬-১৭	৪৩৬ কোটি	৭৪ কোটি
২০১৭-১৮	৪৬৩ কোটি	৫২ কোটি
২০১৮-১৯	৪৮২ কোটি	৬০ কোটি
২০১৯-২০	৫৫৪ কোটি	৫৫ কোটি
২০২০-২১	৬৪৪ কোটি	৩৭ কোটি

(তথ্য : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক)

স্বর্ণপদকের হ্যাট্রিক মেহুলির

বিশেষ প্রতিনিধি।। দক্ষিণ কোরিয়ার দেগুতে এশিয়ান এয়ারগান চ্যাম্পিয়নশিপে পরপর তিনদিনে তিনটি স্বর্ণপদক জিতলেন পশ্চিমবঙ্গের শুটার মেহুলি ঘোষ। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ব্যক্তিগত বিভাগে আগেই সোনা পেয়েছিলেন বৈদ্যবাটির কামারপাড়ার মেহুলি। এবার মিক্সড টিম ইভেন্টের সঙ্গে মেয়েদের দলগত বিভাগের দশ মিটার এয়ার রাইফেলেও সোনা পেলেন তিনি। এর আগেও সাফ গেমে তিনটে পদক জিতেছিলেন মেহুলি। তবে এবার এশিয়ান মিটে সোনা জয়ের হ্যাট্রিককে এখনও পর্যন্ত জীবনের সেরা পারফরম্যান্স বলে মনে করছেন তিনি।

এই মিটে ভারতের জুনিয়াররাও দারুণভাবে সফল হয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার শুটাররা ভারতের কাছেই বেশি হেরেছেন। যা ইদানীংকালে ভারতের বড়ো সাফল্য।

সেখানে এমবিবিএস চিকিৎসকেরা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে ৬০ হাজার টাকায় নিযুক্ত হচ্ছেন। আয়ুষ অধিকর্তাদের মতে প্রকল্পের টাকা ফেলে ফেলে না রেখে যথাযথ খরচ করলেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু সেদিকে রাজ্য সরকার সদিচ্ছা না দেখানোয় শিশুদের রোগ নির্ণয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ধাক্কা খাচ্ছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে পালটা দাবি করা হয়েছে, হয়তো সার্বিক বিষয়টা না জেনেই আরটিআইয়ের জবাব দেওয়া হয়েছে। যে টাকা পড়ে রয়েছে বলে জানানো হয়েছে তা ঠিক নয়। শূন্য পদে কিছুদিনের মধ্যেই নিয়োগ শুরু করবে স্বাস্থ্য দপ্তর।

তবে আয়ুষ অফিসারদের এমবিবিএস চিকিৎসকদের সমান বেতনের দাবি অমূলক। কারণ তাঁরা চিকিৎসা করেন না। স্ক্রিনিং করেন মাত্র।

‘জোর করে ধর্মান্তরণ জাতির জন্য বিপদ’

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জোর করে ধর্মান্তরণ জাতীয় সুরক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রকে পদক্ষেপ করতে বলেছে শীর্ষ আদালত।

টাকার লোভ দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে ধর্মান্তরণ বন্ধে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানান আইনজীবী ও বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়। আগে এক তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই মামলা গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। কিন্তু বিচারপতি এম আর শাহ ও বিচারপতি হিমা কোহলির বেঞ্চ মামলাটি গ্রহণ করেছে। তাঁরা বলেন, ‘এটা উদ্বেগের বিষয়। দেশের সুরক্ষা, ধর্মাচরণ ও বিবেকের স্বাধীনতার উপরে এর প্রভাব পড়তে পারে। তাই ভারত সরকারের উচিত এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে তারা কী পদক্ষেপ করেছে তা জানানো।’ সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে কেন্দ্রের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা। উপাধ্যায় জানান, জোর করে ধর্মান্তরণের ঘটনা কেন্দ্র বন্ধ করতে ব্যর্থ। তাঁর দাবি, এমন ঘটনা বন্ধ না হলে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন। এক্ষেত্রে একটি রিপোর্ট ও বিল তৈরি করার জন্য আইন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন তিনি।

নতুন নির্দেশিকায় সংবাদ সম্প্রচারে সরলীকরণ কেন্দ্রের

বিশেষ প্রতিনিধি, দিল্লি॥ সম্প্রতি দেশের স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলির আপলিংক ও ডাউনলিংক সম্পর্কিত এক নির্দেশিকায় অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভা। এর ফলে যেকোনও অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারি তরফে অনুমতি প্রদান অনেক সহজ হবে। শুধু তাই নয়, এবার থেকে কোনও সরাসরি সম্প্রচারের জন্য আগাম অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না। যেকোনও ভারতীয় চ্যানেল বিদেশি চ্যানেলগুলির খবর সম্প্রচার করতে পারবে। তবে নথিভুক্ত সংস্থা এবং লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ (এলএলপি)-গুলিকে প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমার বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করতে হবে। নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রীসভা এই নতুন নির্দেশিকায় অনুমোদন দেওয়ায় ভারতে নথিভুক্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং এলএলপিগুলি বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলগুলির আপলিংক এবং ডাউনলিংক সংক্রান্ত কাজকর্মে অনুমতি দেওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ হবে হলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। এছাড়া সুবিধা হবে টেলিপোর্ট ও টেলিহাব নির্মাণ, উপগ্রহ ব্যবস্থায় এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহের মতো কাজে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জাতীয় স্বার্থ এবং সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে এমন বিভিন্ন বিষয় ও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের নির্ধারিত নির্দিষ্ট নীতিই অনুসরণ করে চলতে হবে সমস্ত চ্যানেলগুলিকে। সংবাদ সংস্থাগুলি ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। তাদের মতে এর ফলে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের ব্যবসায় গতি আসবে। সেইসঙ্গে বিনিয়োগও বাড়বে। তথ্য ও সম্প্রচার সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকাটি আগের তুলনায় আরও সরল ও বাস্তবসম্মত বলে দাবি সংবাদ সংস্থাগুলির।

রাজ্য চাইলে তেলে জিএসটি : পুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চড়া দামের বাজারে পেট্রল-ডিজেলকে জিএসটির আওতায় আনার দাবি অনেক দিন ধরেই উঠছে বিভিন্ন মহলে। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্যের বিতর্কের জেরে

তা হয়নি। এবার বিষয়টি নিয়ে সরাসরি রাজ্যের কোর্টে বল ঠেললেন তেলমন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরী। তাঁর দাবি, কেন্দ্র তৈরি। রাজ্যগুলি রাজি থাকলেই তা কার্যকর করা সম্ভব। এখন তেলে কেন্দ্রের বসানো উৎপাদন শুল্কের ভাগ পায় রাজ্যগুলি। তাছাড়াও রাজ্যগুলি নিজেরা ভ্যাট চাপায়। যার ফলে পেট্রোল-ডিজেলের দাম অত্যধিক বেড়ে যায়। অভিযোগ নিজেদের মুনাফার ভাগ কমে যাওয়ার জন্যই জিএসটি চালুতে মত নেই রাজ্যগুলির। সোমবার পুরী বলেন, ‘তেলে জিএসটি চালুর জন্য রাজ্যগুলিতে সহমত হতে হবে।

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ২০।।

গুরুর আদেশ মাথা পেতে নিলেন তিনি। তাঁর মনে হলো ঠিক চল্লিশ বছর আগে ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ যদি ভারতবর্ষের বিজয় পতাকা তুলে থাকতে পারেন, তবে তিনিই -বা পারবেন না কেন?

'যেতে নাহি দেব তবু যেতে দিতে হয়।' শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর আদরের দুলাল মহানামকে শেষপর্যন্ত বিদায় দিতেই হলো। কিন্তু মন মানছে না, তাই শেষবারের মতো হৃদয়ের মানিককে বুকে টেনে নিলেন।

(ক্রমশ)